হাসন-গঙ্গা বাহমণি।

(ঐতিহাসিক-উপন্যাস।)

মোহাম্মদ নজিবর রহমান।

১৩২৫—চৈত্র।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত

[মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

প্রকাশক :—

মোহাম্মদ মোবারক আলি।

মখ্‌দুমী লাইব্রেরী।

৫।এ নং কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মেট্‌কাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

এস্‌লামের পুণ্য-প্রদীপ সিরাজগঞ্জ-
সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রগণের
কর-কমলে এই গ্রন্থখানি
প্রীতি-উপহারস্বরূপ
সাদরে অর্পিত
হইল।

নেয়াজমন্দ—

মোহাম্মদ নজিবর রহমান।

কৃতজ্ঞতা।

সাহিত্যানুরাগী প্রথিতযশাঃ যশোহর জেলা স্কুলের এঃ হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ আনোয়ার উল কাদির বি-এ বি-টি সাহেব নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া এই পুস্তক আদ্যন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এ নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

অকিঞ্চন—

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

আমার প্রথম উপন্যাস "আনোয়ারা"তে পানি, ফুফু, আম্মাজান প্রভৃতি মুসলমানী কথা ব্যবহার করায়, খবরের কাগজে একটু আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয় তাহা গায়ে লাগিবার পূর্ব্বেই বিপরীত তরঙ্গাঘাতে তখনই প্রতিহত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গত বৎসর সাহিত্য-সম্মিলন-ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, যাহা চলিত, যাহা সকলে বুঝে, তাহাই চালাও। যাহা চলিত নয়, তাহা আনিও না। যাহা চলিত তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক চালাও। প্রবীণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতটী আমাদের বড়ই পছন্দ। তাই উপস্থিত গ্রন্থেও পানি, জানানা, একছার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারে সঙ্কোচ বোধ করি নাই। পরন্তু হিন্দু মুসলমানের হরি-হরবৎ মিলন যেমন উভয় সম্প্রদায়ের উদারচরিত্রগণের অভিন্ন অভিপ্রায়; তেমনি উভয় জাতির ধর্ম্মমূলক প্রাণের শব্দ-প্রসূনগুলি ভা'য়ে ভা'য়ে, গায়ে গায়ে মিলা মিশা থাকার ন্যায় একসূত্র-গ্রথিত থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। তাহাতে পরস্পর জাতীয় প্রীতিবর্দ্ধনের আশা করা যায়।

আর একটি কথা—আমার প্রণীত উল্লিখিত "আনোয়ারা" পুস্তকের বহুসংখ্যক পাঠক পাঠিকা, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইহা পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং অনেকে এখনও লিখিতেছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে ইহা দ্রুতভাবে মুদ্রিত হওয়ায় ইহাতে ব্যাকরণ ও ভাষাগত অনেক ভুল রহিয়া গেল। সদাশয় পাঠক পাঠিকা এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আধুনিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা মৃতজাতির মধ্যে গণ্য হইলেও ইতিহাসের আশীর্ব্বাদে আমরা অমর ও জগদ্বরেণ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস পাঠে আজকাল আমাদের মনোযোগ বড় কম। তাই ভাবিয়াছিলাম, "হাসন-গঙ্গা বাহমণি"র আর সংস্করণ হইবে না। আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি,— আমার ভ্রান্তধারণা কাটিয়া গিয়াছে। দয়াময় আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে ও আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের কৃপাদৃষ্টিপাতে বৎসর-কালমধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। পরন্তু অনুগ্রহ প্রকাশপুরঃসর কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার প্রথম সংস্করণের যে সকল ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্টে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত এই সংস্করণে সাধ্যানুসারে সে সকল দোষ পরিহারের চেষ্টা করিয়াছি। এবং তাহা করায় পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইল। ইতি।

গ্রন্থকার।

হাসন-গঙ্গা বাহমণিসম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

বঙ্গভাষার উদীয়মান সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক, পাবনা সাহাজাদপুর নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ নবী নওয়াজ খাঁন এম, এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—

“আপনার দ্বিতীয় উপন্যাস “হাসন-গঙ্গা বাহমণি” কলিকাতা ৫।এ কলেজ স্কোয়ার মখ্‌দুমী লাইব্রেরী হইতে লইয়া পাঠ করিয়াছি। রাত্রিতে এক বৈঠকে বইখানি পড়িয়া শেষ করিয়া তবে শান্ত হই। গল্পের ভাগের তুলনায় পারিপার্শ্বিক বর্ণনা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সমস্ত বইখানি পড়িয়া মনে হয় যেন আর্ট বা রচনা-শিল্প দেখাইবার জন্যই ইহা লিখিত হইয়াছে। “আনোয়ারা”র প্রধান মনোহারিত্ব উহার গল্পে, কিন্তু “হাসনগঙ্গা”র বিশেষত্ব ইহার রচনানৈপুণ্যে। বঙ্কিমবাবুও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস “দুর্গেশনন্দিনী” শুধু গল্পের হিসাবে উপভোগ্য, কিন্তু তদনন্তর লিখিত “কপালকুণ্ডলা” রচনাকলা হিসাবে অধিকতর মনোরম। ইংরাজ স্ত্রী ঔপন্যাসিক জর্জ্জ ইলিয়টেও তাহাই দেখিতে পাই। তাঁহার প্রাথমিক কালের উপন্যাসাবলীর মধ্যে “সাইলাস মার্ণার” গল্পহিসাবেই বিশেষ মনোহর। আর একটু পরিণত হস্তের লেখার মধ্যে রমোলা শিল্পের ভাগে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতিভা ফুটাইয়াছে। সমঝদার পাঠকের নিকটে এই হিসাবে “হাসনগঙ্গা” “আনোয়ারা”

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থানলাভ করিবে। কিন্তু সাধারণ লোক—যাহারা শুধু গল্পই ভালবাসে তাহাদের নিকটে "আনোয়ারা"ই অধিক সমাদর লাভ করিবে। কিন্তু সাধারণ লোক যাহাই বিবেচনা করুক, "হাসনগঙ্গা" সাহিত্য-রাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। কলা-হিসাবে ইহাকে বঙ্কিমবাবুর যে কোন উপন্যাসের পাশে বসাইয়া দেওয়া যায়। রচনানৈপুণ্যে ইহা জর্জ্জ ইলিয়টের যে কোন ইংরেজী উপন্যাসের সহিত তুলিত হইতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, এমন একখানি গ্রন্থ মোসলমান-সমাজ হইতে বাহির হইয়াছে। দীর্ণ দুঃস্থ সমাজের নিকট হইতে শিল্পের এই বিশাল সাধনা, ভাবরাজ্যের এই মরকত মণিলাভ অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য।

জেলা খুলনা, পোঃ বাঁশদহা হইতে মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব (১) লিখিতেছেন ;—

"জনাব মৌলবী সাহেব,

আচ্ছালাম আলায়কুম, বাদ আরোজ,—আপনার সহিত আমার বাহ্যপরিচয় না থাকিলেও আপনার বইয়ের মধ্য দিয়া পরিচয় হইয়াছে। আপনার "আনোয়ারা" পাঠ করিয়া

---

(১) ইঁহার বিশেষ কোন টাইটেল থাকা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা জানিতে পারি নাই। ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উল্লিখিত পত্র লিখিয়াছেন।

আনন্দিত হইয়াছিলাম, হাসনগঙ্গা পাঠে বিস্ময়পুলকে অভিভূত হইয়াছি। আপনার ন্যায় ঔপন্যাসিক আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান, একথা ভাবিতেও গৌরব অনুভব করিতেছি। আপনি যেরূপ আর্টের সহিত হাসনের প্রতি তারার প্রণয় ব্যাপারের পরিণতি ঘটাইয়াছেন তাহা সম্যক্ প্রশংসনীয়। বাস্তবিক এমন বিসদৃশ ব্যাপার এমন স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিতে অতি অল্পসংখ্যক লোকই সমর্থ হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্যাপারে যে এতটা স্বাভাবিকত্ব রক্ষা পাইবে, বইখানি পড়িবার পূর্ব্বে তাহা আমার বিশ্বাস হয় নাই। চাঁদের তপঃকঠোর সংযম ও প্রভুপরায়ণতা এবং তারার অনাহূত নিষ্কাম প্রেম এমন উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে যে, তাহার তুলনা বঙ্গসাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও বিরল।

জেলা খুলনা, পোঃ গুর্ণগ্রাম, গ্রাম চাঁদনী হইতে মৌলবী মোহাম্মদ মোজাহের উল্লা সাহেব (১) লিখিয়াছেন;—

"ভক্তিভাজন কবিবর! আদাব গ্রহণ করুন।

আপনার লেখনীপ্রসূত অমিয়ভাষায় লিখিত "আনোয়ারা" নামক গ্রন্থ পাঠে কি যে এক হৃদয়-মন-তৃপ্তিকর আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। আপনিই সাহিত্যিক জগতে বঙ্গ মোস্‌লেম কবিদিগের মধ্যে উপন্যাস প্রণয়নে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আপনি যে সর্ব্বজনপ্রীতিকর সুধা-

---

(১) ইনি উচ্চশিক্ষিত কৃতবিদ্য লোক সন্দেহ নাই।

স্রোত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা প্রাজ্ঞমণ্ডলী কখনও স্মৃতিপথ হইতে অপনয়ন করিতে পারিবেন না।

অদ্য আপনার "হাসন-গঙ্গা বাহমণি" নামক পুস্তক খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। ইহার রচনানৈপুণ্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। ইহার ভাষা ও ভাব উত্তম হইয়াছে।"

জেলা নদীয়া, পোঃ গাঁড়া ডোব নিবাসী বিখ্যাত এস্লাম প্রচারক শেখ জমির উদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব লিখিয়াছেন ;—

"আমি জীবনে কখন নাটক নভেল পড়ি নাই বলিলেই চলে, তবে বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর ২।১ পাতা উল্টাইয়াছিলাম। আপনার দেশবিখ্যাত উপন্যাস "আনোয়ারা"ও পড়ার মত করিয়া পড়ি নাই। মোটামুটি ভাবে পড়িয়াছি। কিন্তু আপনার প্রণীত "হাসন-গঙ্গা" পড়িয়া একান্ত বিমোহিত হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রায় যাবতীয় উপন্যাসের ভিতর দিয়া মোসলমানকে দারুণ অভদ্রোচিত ভাবে গালাগালি দিয়াছেন কিন্তু আপনি এক হাসন গঙ্গার ভিতর দিয়া অতিশয় ভদ্রোচিত ভাবে সূক্ষ্ম কৌশল সহকারে তাহার যেন সমস্ত তিরস্কারের উত্তর দিয়াছেন। ধন্য আপনার তুলি! যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে শিক্ষা দীক্ষা সবই আছে। জটিল মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বেশী না যাইয়া সরল সুন্দর ধর্ম্মভাবের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যে উপন্যাস গড়াইয়াছেন ইহা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

হাসন-গঙ্গা বাহমণি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রূপসমালোচনা।

এখন হইতে প্রায় ছয় শত বৎসর আগের কথা।

সেই সময় একদিন গ্রীষ্মের ঊষায় অমরাবতী হইতে একজন কৃষাণযুবক ক্ষেত্রকর্ষণমানসে মাঠে যাইতেছিল। সে মালকোঁচা মারিয়া কোদালী স্কন্ধে করিয়া ঘরের বাহির হইতেই একখানি যৌবনবিকশিত সজীব রূপপ্রতিমা দুলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই। বালিকার শ্লথ কুন্তল-কবরী অংসবিলম্বিত, বক্ষঃবসন বিত্রস্ত, অঞ্চল ধরালুণ্ঠিত; কিন্তু এমনি তাহার প্রয়োজন, এমনি তাহার ব্যাকুলতা যাহার জন্য সে এ সকল লজ্জাজনক বিশৃঙ্খলতার প্রতি লক্ষ্যই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

রূপজ্ঞ পাঠক এই অবসরে প্রতিমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া ধন্য হউন। দেখুন কি অলৌকিক রূপ! কি মোহনমাধুরী! এমন রূপ কি মানবীতে সম্ভবে! এরূপের তুলনা মর্ত্ত্যে নাই।

বিধাতা নিশ্চয়ই নিজহাতে এ প্রতিমা গড়িয়াছেন। হায়, আমি কেমন করিয়া এই অতুলনীয়া নিরুপমা প্রতিমার রূপ বর্ণন করিব? প্রতিমার দিকে চাহিয়া আমার ভাষা স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে এবং জড়তার বশবর্ত্তী হইয়া বলিতেছে—"ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

রূপজ্ঞ পাঠক। (আপনার কথার ভাবে ও অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে, লেখক ও কবিরা যে বদ্ধ পাগল, তাহাতে সংশয়ের কিছুই নাই। আবার পাগলামিবশে তাঁহারা যখন তিলকে তাল করিয়া তোলেন, মরুভূমে নন্দনকাননের সৃষ্টি করিয়া বসেন, মনোরথে চড়িয়া স্বর্গের পানে উধাও হন, তখন তাঁহাদের সত্য মিথ্যা পাপ পুণ্যের জ্ঞান থাকে না।)

লেখক। কেন? কেন মহাশয়, বেচারাদিগের প্রতি এমন নিষ্ঠুর দোষারোপ করিতেছেন?

রূপজ্ঞ। আপনি বলিতেছেন, আপনার প্রতিমা অতুলনীয়া নিরুপমা; ইহাও কি সম্ভব? মানুষের রূপগুণে এ দুটি বিশেষণ প্রয়োগ পাপজনক; কারণ, খোদা ও ধর্ম্ম ব্যতীত জগতে অতুলনীয় নিরুপম আর কি আছে? আরও দেখুন, এত বড় জড়জগৎ,—এত বড় মানবী জগৎ, এতন্মধ্যে আপনার প্রতিমার উপমান নাই, ইহা হইতেই পারে না।

লেখক। বেশ কথা, তাহা হইলে আপনিই আমার প্রতিমার রূপবর্ণনার ভার গ্রহণ করুন এবং তাহার উপমান কোথায় দেখাইয়া দিন্।

রূপজ্ঞ। (হাসিয়া) আপনিই যদি পরস্মৈপদে স্বর্গে যাইতে চান, তবে আধুনিক চৌর লেখক বা কবিরা যে পথ ধরিয়া অমর হইতে বাসনা করেন, আপনি সেই পথ অবলম্বন করুন।

লেখক। মহাশয়, মদীয় অক্ষমতায় তাহাই স্বীকার্য্য ; কিন্তু একটু পথে তুলিয়া দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

রূপজ্ঞ। আপনি বেশ লোক ! নিজেও জাহান্নামে যাইবেন, পরকেও টানিয়া লইতে চান ?

লেখক। মহাশয়, আমরা ত সবাই দিনরাত ঐ পথ পরিষ্কার করিতেছি ; ভাবিয়া কি হইবে ?

রূপজ্ঞ। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা লিখুন,—

"তিলফুল যিনি নাশা
চোখ দুটি ভাসা ভাসা।"

ইহা বলিয়া রূপজ্ঞ নীরব হইলেন।

লেখক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনার রূপবর্ণনা কি শেষ হইল ?"

রূপজ্ঞ। হাঁ, আমি ত তাই মনে করেছি। বেশী কথার মূল্য কম ; ইহাই যথেষ্ট।

লেখক। না, না, যদি চুরিতে গেলাম, তবে যাতে পেট ভরে—তৃপ্তিলাভ ঘটে, এমনটি দেখাইয়া দিন্।

রূপজ্ঞ। তবে লিখুন,—

"নয়ন কেবল নীল উৎপল
মুখ শতদল দিয়া গড়িল,

কুন্দে দন্তপাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল ।”

লেখক। উপমান কয়েকটি আমার প্রতিমার চোখ-মুখের সহিত অনেকটা খাপ খাইতেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গের বর্ণনা হইল কৈ ?

রূপজ্ঞ। আপনি দেখ্‌ছি, আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করিলেন !

লেখক। আপনি লতা পাতা ফুল রাখিয়া কোন জীবন্ত উপমান দেখান।

রূপজ্ঞ। তবে লিখুন,—

“কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা
পদনখে পড়ে তা'র আছে কতগুলা।”

লেখক। হো ! হো !! হো !!! এইবার সব মাটি করিলেন।

রূপজ্ঞ। (অপ্রস্তুত হইয়া) কেন ? কি হইল ?

লেখক। আমার প্রতিমা যে ছয়শত বৎসর আগে গড়ান। সে সময়ে বিদ্যা বর্দ্ধমানে পয়দাই হয় নাই, সুতরাং বর্ণনায় কালানৌচিত্য দোষ ঘটিতেছে ; পরন্তু আমার প্রতিমা বিদ্যার দেশের নয়, সীতার দেশের।

রূপজ্ঞ। (একটু বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা স্পার্টার রাজকন্যা বিশ্বমোহিনী হেলেনা আপনার প্রতিমার সদৃশী হইবেন কি না দেখুন।

লেখক। সে ত তুষারধবলা, নীলনয়না, নাতিদীর্ঘপিঙ্গল-

কেশা। আর আমার প্রতিমা নবারুণরাগরঞ্জিতা ঊষাবরণা, ইন্দীবরনিন্দি স্নিগ্ধনয়না, আগুল্‌ফ-লম্বিত বৈশাখী ঘনকৃষ্ণকুন্তলা।

রূপজ্ঞ। (ক্রোধভরে) তবে মিশর-সুন্দরী ক্লিউপেট্রা আপনার প্রতিমার উপযুক্ত উপমান।

লেখক। যদি তিরস্কার করিবার ইচ্ছা থাকে, অন্যরূপে করুন, তথাপি যৌবনগর্ব্বিতা বারবনিতার সহিত আমার প্রতিমার তুলনা করিবেন না। আমার প্রতিমা পবিত্র ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতা অনাঘ্রাত কুসুমকলিকা।

রূপজ্ঞ। আচ্ছা, তবে জোলেখা কেমন?

লেখক। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা হইলেও সে ত' চঞ্চলা সৌদামিনী। দৃষ্টিমাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যায়। আর আমার প্রতিমার রূপ চন্দ্রকিরণতুল্য স্নিগ্ধ ও আনন্দদায়ক। কটিদেশ দেহায়তনরূপে সুগঠিত ও সূক্ষ্ম; শতদলবিনিন্দিত সুকোমল বক্ষঃ। আবার বক্ষের উভয় প্রান্ত গোলাপ-কলিকাগ্রভাগবৎ সুন্দর ও ঈষদুন্নত। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা তাকাইয়া দেখুন, আপনার অন্তঃকরণ কেবল নির্ম্মলানন্দে ভরপূর হইয়া উঠিবে। ভক্তের দেবী দর্শনের ন্যায় স্বর্গীয় ভবোচ্ছ্বাসে আপনার হৃদয় নাচিতে থাকিবে। তখন আপনি কেবল স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিবেন—অহো! আজ কি দেখিলাম!!!

রূপজ্ঞ। তবে বুঝি লোকললামভূতা শকুন্তলা, সীতা, সাবিত্রী, লাইলী, শিরি—ইঁহাদের কেহই আপনার প্রতিমার সদৃশী হইবেন না?

লেখক। বিচার আবশ্যক।

রূপজ্ঞ। কেন? শকুন্তলা ত' যৌবন-কুসুমোদ্যানের পরিমলভরস্পন্দিত বিকশিত পারিজাত।

লেখক। কিন্তু মদনশরাঘাতে অধৈর্য্য হইয়া তিনি একেবারেই সমস্ত মধু দুষ্মন্ত-ষট্‌পদে ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

রূপজ্ঞ। আচ্ছা, সীতা ত' সৌন্দর্য্যসাগরের চন্দ্রকান্ত মণি, সাবিত্রী স্পর্শমণি, লাইলী মরকত মণি এবং শিরি সূর্য্যকান্ত মণির তুল্যা।

লেখক। আপনার কথা সত্য এবং শিরোধার্য্য, কিন্তু চেয়ে দেখুন আমার প্রতিমা যে লাবণ্য-সাগরের কোহিনুর!

রূপজ্ঞ। বৃথা তর্কে আপনার সঙ্গে পারা কঠিন। তথাপি আর একটি উপমান দেখাইতেছি—শারদীয়া সপ্তমীতে শাক্তভক্তভবনে অধিষ্ঠিতা নিত্যযৌবনা দুর্গা মূর্ত্তি দেখিয়াছেন ত? ওটি আপনার প্রতিমার তুলনীয়া হয় কি না?

লেখক। এতক্ষণে আপনার শ্রম অনেকটা সার্থক হইল। তবুও সত্যের অনুরোধে বলিতেছি, দুর্গা দশভুজা ষোড়শী, আর আমার প্রতিমা দ্বিভুজা পঞ্চদশী। যাহা হউক, এসম্বন্ধে আপনাকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। এখন আসুন দেখা'বা শুনা যাউক, এত প্রত্যূষে অমন ভাবে সে কৃষাণ-যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ছাতু-প্রত্যাখ্যান।

বালিকা কৃষাণ-যবকের নিকটে উপস্থিত হইলে যুবক কহিল, "দিদিমণি, এত সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াছ কেন ?"

বালিকা। তাও তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠি নাই।

যু। কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে ঘুম হইতে উঠিবার কি আবশ্যক ?

বা। তুমিই বা এত প্রত্যুষে উঠ কেন ?

যু। মাঠে যাইতে হয় বলিয়া।

বা। এক আধটুকু বিলম্বে গেলে হয় না ?

যু। সকালে যে কাজ হয়, সারাদিনে তাহা হয় না।

বা। আমি প্রত্যহ ভোরে তোমাকে খাবার দিতে চাই, কিন্তু ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, তুমি চলিয়া গিয়াছ। তাই আজ তোমার আগে উঠিবার জন্য সতর্ক হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম।

যু। দিদিমণি, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট পাইবে কেন ?

বা। এত বেলা না খাইয়া থাকা যায় কি ? বালিকার এই প্রীতির বাণী মধুর ঝঙ্কারে যেন দিগন্ত অমৃতায়মান করিয়া তুলিল। ফলতঃ পতিগতপ্রাণা পত্নী এরূপ ক্ষেত্রে পতিকে যে সুরে যে ভাবে কথা বলে, বালিকার কথার ভাব সেইরূপ

বোধ হইতেছিল ; যুবক কিন্তু তদ্ভাব লক্ষ্য না করিয়া জলের মত সহজ ভাষায় বলিল,—"আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।"

বালিকা পুনরায় প্রীতির আব্‌দারে কহিল,—"হউক তোমার অভ্যাস, তুমি একটু বিলম্ব কর।" এই বলিয়া বালিকা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, এবং একটু পরে একথালা যবের ছাতু ও একছড়া পাকা অনুপম কলা আনিয়া যুবকের হাতে দিল, পরে আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়া একবাটি ঘরপাতা দই লইয়া আসিল। দধি ছাতুর মধ্যে ঢালিয়া দিতেই যুবক কহিল,—"থাম, আমি ছাতু লইলাম। দধি কলা তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

বা। কেন ফিরাইয়া লইব ?

যুবক বলিল,—"শ্যামার ত' আর এখন বেশী দুধ হয় না, তা যদি অমন করিয়া তিন বেলা আমাকেই দিবে, তবে তোমরা কি খাইবে ? কলাগুলি ত' বিক্রয় করিলে অনেক সময় হাট-খরচ চলিতে পারে।" বালিকাদিগের গাভীর নাম শ্যামা।

বালিকা এবার একটু সদুঃখ-অভিমানের স্বরে কহিল,—"সে সব আছে। আমি এগুলি তোমার জন্যই রাখিয়াছিলাম।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"মাকে বলিয়া আনিয়াছ ?" যুবক বালিকার মাকে মা বলিয়া ডাকে।

মিথ্যা কথা কাহাকে বলে, বালিকা জন্মেও জানে না। পিতামাতা তাহাকে এমনই সাবধানে শিক্ষা দিয়াছেন। তাই সে কহিল,—"মা এখনও ঘুমাইয়া আছে।"

যুবক "তবে আমি এ সকল কিছুই লইব না।" এই বলিয়া

কোদালী স্কন্ধে লইয়া রোস্তমের ন্যায় বীর দর্পে পাদক্ষেপ করিতে করিতে প্রান্তরের পথে প্রস্থান করিল।

বালিকা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাখ্যান-আঘাতে তাহার হৃদয় যেন শত খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রমে আয়ত আঁখি-তার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

:•:-

পারিবারিক পরিচয়াদি।

অমরাবতী দিল্লীর অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান গ্রাম। গ্রামখানি দক্ষিণমুখী, সম্মুখে পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা সুবৃহৎ রাজপথ। গ্রামের মধ্যস্থলে জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাটী। বহির্ব্বাটীর চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহার পুষ্পোদ্যান। সাময়িক ফুলকুলে উদ্যান নিয়ত প্রফুল্ল। আবার ফুলের ন্যায় প্রফুল্ল ব্রাহ্মণের এক যৌবনোন্মুখী কন্যা প্রত্যহ প্রভাতে সেই স্ফুটিত ফুলকুল চয়ন করিয়া সাজি ভরে। ব্রাহ্মণ যথাসময়ে তাহা দিয়া গৃহ-বিগ্রহের পূজা করেন। বাড়ীর পশ্চিমাংশে পুষ্করিণী, তাহার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে নিশাগমে কুমুদ হাসে, দিবাগমে পদ্মভাসে। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পশ্চিম দুই তীরে সুরসাল ফলের বাগান। উপস্থিত গ্রীষ্মাগমে বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ফলগুলি কুস্থানে পতিত না হয় এ নিমিত্ত বৃক্ষতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। এমন কি, এখন বৃক্ষতলে ফুঁ দিয়া অন্ন পরিবেশন করা চলে। ব্রাহ্মণ আচারশুচি, তাই তাঁহার বৃক্ষবাটিকার এমন বন্দোবস্ত। কোন স্থানে দুই চারিটি কিশোর খর্জ্জুরবৃক্ষ, কোন স্থানে নবাঙ্কুরিত

তাল-শিশু উন্নত বৃক্ষরাজীর তলে থাকিয়া শাখাপত্র বিস্তারপূর্ব্বক সেই স্বচ্ছতল-উদ্যানভূমির শোভা সম্পাদন করিতেছে।

কোন স্থানে সুবৃহৎ বলিষ্ঠ দ্রুমাবলী যেন পরস্পর সন্ধিসূত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কালবৈশাখীর অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া রহিয়াছে। স্থানান্তরে ক্ষীণাঙ্গী ব্রততী বৃক্ষ-স্বামীর দেহ জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমগর্ব্বে তাহাকে আতপ নিবারণের আদেশ করিতেছে। প্রেমিক তরুবর সানন্দে শ্যামল-পত্রাবলীচ্ছত্রে ভার্য্যার দেহরক্ষা করিতেছে। কোথাও বা ফল-পুষ্পবিহীন অনুন্নত বন্ধুরদেহ গুল্মগণ অস্পৃশ্য তির্য্যগ্‌জাতির ন্যায় অদূরে দাঁড়াইয়া বৃক্ষ-বল্লরীর প্রেমময় জীবনের কার্য্য দেখিতেছে এবং হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

বাটীতে যাতায়াতের জন্য ঠাকুর-আঙ্গিনা হইতে একটি রাস্তা পুষ্করিণীর পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া উদ্যান ভেদ করিয়া অদূরবর্ত্তী রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পুরোভাগে উভয় পার্শ্বে গগনস্পর্শী দুইটি দেবদারুবৃক্ষ; তাহার পশ্চাদ্ভাগে দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধ গুবাকবৃক্ষসমূহ। দেখিয়া বোধ হয়, দেবদারু দুইটি যুদ্ধযাত্রী অগ্রগামী সেনাপতির ন্যায় এবং গুবাকবৃক্ষ-সমূহ অনুগামী সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় বীরদর্পে দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

ফলতঃ প্রাবিটের বৈকালিক বর্ষণের পর প্রকৃতি নির্ম্মল প্রশান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, পশ্চিম গগনগায়ে স্তূপস্তর মেঘাচল সন্দর্শনে নয়নের যেরূপ আনন্দ জন্মে, দূর হইতে এই

উদ্যানের তরঙ্গায়িতশীর্ষ শ্যামল পাদপ-পত্রাবলীর সবুজ শোভা তদ্রূপ চিত্ত মুগ্ধ করিয়া থাকে। দেবদারুর উন্নতশির দেখিয়া দূরবর্ত্তী বাসেন্দা অঙ্গুলিসঙ্কেতে নির্দ্দেশ করে—ঐ যে ঠাকুরবাড়ী দেখা যাইতেছে।

অমরাবতী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মরূদ্যান। এ উদ্যানে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রায়শঃ উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। অপ্রাপ্য নারিকেল, সুপারী বৃক্ষও এখানে সহজপ্রাপ্য।

উদ্যানস্বামী দেশের লোকের নিকটে ঠাকুর মহাশয় বলিয়া পরিচিত। তিনি এখন যৌবনের সীমা ছাড়াইয়া বিয়াল্লিশে পা দিয়াছেন। দেখিতে দেব-সেনাপতির ন্যায় সুন্দর, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ বোধ। তাঁহার গণনার প্রতি আপামর দেশের লোকের বিশ্বাস। পার্শি ভাষাতেও তাঁহার অধিকার আছে। তদানীন্তন দিল্লীর অনেক আলেম ওলমার সহিত তিনি পরিচিত। বাদশার দরবারেও তাঁহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলক তাঁহাকে ভালবাসেন। ঠাকুর মহাশয় মুসলমানকে ঘৃণা করেন না, কিন্তু স্বধর্ম্মে আস্থাবান্। তিনি মাথায় শিখা, কণ্ঠে মালা, অংসে উপবীত ধারণ করেন। বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া বসতবাসের নিমিত্ত আরও ৫।৭ খানি ঘর। ঘরগুলিতে খড়ের ছাউনী। ঠাকুর মহাশয়ের অবস্থা বেশী স্বচ্ছল নহে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্র, একজন পরিচারিকা, একজন কৃষাণ চাকর, দুইটি হালের গরু, একটি সবৎস-গাভী, একটি

কুকুর ও একটি বিড়াল এবং স্বয়ং ঠাকুর মহাশয়। পরিবারের সমস্তগুলি প্রাণীই সদাশয় ঠাকুর মহাশয়ের অন্নজলে পরমাদরে পালিত।

ঠাকুর মহাশয়ের স্ত্রীর নাম মহামায়া, কন্যার নাম তারা, পুত্রের নাম পরীক্ষিত; চাকরাণীর নাম পদ্মা, চাকরের নাম চাঁদ। হালের গরু দুইটির একটির নাম বলরাম, অপরটির নাম কানাই। গাভীর নাম শ্যামা। শ্যামার কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। শ্যামার বৎসের নাম বগা, কুকুরের নাম বাঘা, বিড়ালের নাম বিলাসী। ঠাকুর মহাশয়ের ডাকনাম গঙ্গু। কোষ্ঠীতে লেখা আছে গঙ্গারাম দেবশর্ম্মণঃ।

পাঠক যদি বিরক্ত না হন, তবে ঠাকুর-পরিবারের বয়সের একটা হিসাব এখানেই আপনাকে দিয়া রাখি।

মহামায়া ও শ্যামা মধ্যযৌবনা। তারা যৌবনোন্মুখী; পরীক্ষিত ও বগা প্রায় সমবয়সী শিশু। পদ্মার বয়স ঠাকুর মহাশয়ের বয়সের সদৃশ। চাঁদ নবীন যুবক। বলরাম, কানাই অর্দ্ধ বয়সের; বাঘা ও বিলাসী পূরা যোয়ান। আবার বয়সের সাদৃশ্যে এই পরিবার একে অন্যের প্রতি ভালবাসাসম্পন্ন। মহামায়া শ্যামাকে ভালবাসেন। ভাতপানি খইল বিচালিতে শ্যামার নিত্য পেট ভরে কিনা সেদিকে মহামায়া দেবীর বিশেষ দৃষ্টি। তারা নিজের সুখস্বচ্ছন্দ ভুলিয়া চাঁদের খাওয়া পরার প্রতি একান্ত মনোযোগিনী। বলরাম ও কানাই যখন গোশালে থাকে, তখন পদ্মা তাহাদের সেবায় রত। পরীক্ষিত বগাকে

পাইলে সব ভুলিয়া যায়। বিলাসী অনেক সময় বাঘার মুখের কাছে শুইয়া লেজ নাড়িতে থাকে, বাঘাও কখন কখন বিলাসীর গায়ের মশামাছি চপ্ করিয়া কামড় দিয়া ধরে। বাঘার গুণ অনেক। সে সারারাত্রি জাগিয়া ঠাকুর-বাড়ী চৌকী দেয়। চোর ডাকাইত দূরে থাক্, তাহার ভয়ে বৃক্ষপত্র সর্ সর্ ধ্বনি করিতে পারে না। পাখী পাখ্সাট্ দিতেও সাহস পায় না। বাঘার মত প্রভুভক্ত কুকুর বিরল। কিন্তু তাহার এক দোষ,—সে উচ্ছিষ্ট-ভোজনের সময় তাহার বন্ধু বিলাসীকে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না; বিলাসীও নির্দ্দোষ নহে। সে একান্ত আলস্যপরায়ণ ও নিদ্রালু। রাত্রিকালে মূষিক গৃহমধ্যে কাটুর-কুটুর বা হুড়া-তাড়া আরম্ভ করিলেও সে একবার মাত্র কাণ খাড়া করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু সে যখন পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া বিনাহ্বানে উচ্ছিষ্ট ভোজনে বন্ধুর কাছে যায়, তখন বাঘা মনে করে, আমি সারারাত প্রভুর বাড়ীতে চৌকী দেই, সুতরাং এ খাদ্য আমারই হক। নিদ্রালু আলস্যপরায়ণ বিলাসী ইহার অংশ পাইতে পারে না। এইরূপ ভাবিয়া সে বিলাসীকে উচ্ছিষ্টের নিকট ঘেঁসিতে দেয় না। আরও কাপুরুষ মনে করিয়া ঘৃণার চক্ষে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে; কখন কখন ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে থাবা মারিতে উদ্যত হয়। বিলাসী ভয়ে জড়সড় হইয়া তখন দূরে যাইয়া উপবেশন করে এবং করুণ-নয়নে বাঘার মুখের দিকে চাহিয়া মিউ-মিউ স্বরে উচ্ছিষ্ট ভিক্ষা চাহে। হায়, পেটের জ্বালা! কিন্তু এ জ্বালায় অস্থির না হয়

জগতে এমন কে আছে? অচেতনের এ জ্বালা আছে কি না, শুনিতে পাই বৈজ্ঞানিকেরা তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। চেতন ও উদ্ভিদ্ যে ঐ জ্বালায় ব্যাকুল তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিরহস্য এই জ্বালাময় জঠরাভ্যন্তরেই নিহিত। কারণ পেটের জ্বালা না থাকিলে দুনিয়া অচল হইত; সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আরও মনে হয়, আমাদের দেহ যেন প্রকৃতির বাষ্পযান। অগ্নিগর্ভজঠর তাহার ইঞ্জিন, ভাত-পানি তাহার জল-কয়লা সদৃশ। এই বাষ্পীয় যান চালাইতে হইলে বাধ্য হইয়া ইঞ্জিনে জল-কয়লার বন্দোবস্ত করিতে হয়, না করিলে ইঞ্জিন চলিবে না; অচল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, আবার ইঞ্জিন না চলিলে যান অচল হইবে। যান অচল হইলে, জান রক্ষা অসম্ভব। তাই দেহধারী তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম জান রক্ষায় জঠর-ইঞ্জিনে ভাত-পানিরূপ জল-কয়লার বন্দোবস্তে এত ব্যস্ত। আবার পৃথিবীতে যাহারা স্ব স্ব পরিশ্রমবলে জঠর-ইঞ্জিনের জল-কয়লা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা পুরুষ; যাহারা অক্ষম তাহারা বিলাসীর ন্যায় কাপুরুষ। কাপুরুষের জীবনধারণ বৃথা। ইহারা পরের গলগ্রহ হইতে লজ্জা বোধ করে না। মলবাহীর দুর্গন্ধসহনবৎ পরপিণ্ডোপজীবীর ঘৃণা-অপমান জ্ঞান থাকে না।

ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র দেবতার ন্যায়। তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় তিনি এই পাপপঙ্কিল দুনিয়ার মানুষ

নহেন ; কোন অনাবিল শান্তির রাজ্য হইতে কিছু দিনের জন্য এখানে আসিয়া বসতবাস করিতেছেন। তাঁহার হৃদয় দয়া মায়া প্রীতি বাৎসল্যের খনি। বস্তুতঃ তিনি "উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকং" মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহার মহান্ হৃদয়ের ভালবাসা স্বীয় পরিবারের তথা সর্ব্বজীবের উপর সমান।

দিল্লীর গুণগ্রাহী সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলক, ঠাকুর মহাশয়ের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কিছু জমি নিষ্কর করিয়া দিয়াছেন। সম্রাট্-প্রদত্ত নিষ্কর জমি উপভোগ করিয়া একরূপ সুখ-শান্তিতে ঠাকুর মহাশয়ের দিন গোজরাণ চলিতেছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য চাঁদ, ঠাকুর মহাশয়ের নিষ্কর ভূমি কর্ষণ করে। হাট-বাজারে ফলমুল বিক্রয় করিয়া সংসারের বাজে-খরচ চালায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চাঁদ ও তারার বাল্যজীবন।

চাঁদ খোরাসান দেশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত পাঠানের পুত্র। পাঠানেরা প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু চাঁদের পিতার হৃদয় দয়া-মায়ায় পূর্ণ ছিল। তিনি স্বাধীন ভাবে 'মেওয়া'র ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং এই উপলক্ষে তিনি সস্ত্রীক মহানগরী দিল্লীতে আসিয়া অবস্থান করেন। কালক্রমে এই স্থানে চাঁদের এক ভগিনী ও চাঁদ জন্মগ্রহণ করে। চাঁদের জননী চাঁদকে গর্ভে ধারণ করিয়া অনেক বার স্বপ্ন দেখেন—আকাশের চাঁদ আসিয়া তাঁহার অঙ্ক শোভিত করিয়া আছে। এ নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জননী পুত্রের নাম চাঁদ রাখিয়াছিলেন। চাঁদের ঐতিহাসিক নাম হাসন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা তাহার 'জাফর' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা উপস্থিত আখ্যায়িকায় ঐতিহাসিক গোলমালে না গিয়া, মাতৃদত্ত চাঁদ নামেরই অনুসরণ করিয়া চলিব।

চাঁদের পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দিল্লীতে বসন্তের মহামারী উপস্থিত হয়। চাঁদের পিতা এই দেশব্যাপী মহামারীর ভয়ে

সপরিবারে দিল্লী হইতে কিছুদূর ব্যবধান এস্‌লামাবাদে আসিয়া বসত্‌বাস আরম্ভ করেন। এখানে আসিয়া পাঁচবৎসর অবস্থানের পর, যে ভয়ে তাঁহারা দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বনাশী বসন্ত-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একদিন অগ্রপশ্চাতে চাঁদের মাতা পিতা উভয়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। চাঁদের পিতা ব্যয়বাহুল্যে বড়ই মুক্তহস্ত ছিলেন, এ নিমিত্ত মৃত্যুর সময় তিনি এক কপর্দ্দকও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পরন্তু অনেক টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। পিতামাতার অকাল-মৃত্যুতে দশবৎসরের বালক চাঁদ দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সামান্য স্থাবর অস্থাবর যাহা ছিল, উত্তমর্ণেরা ভাগ বণ্টন করিয়া লইল। এইরূপে চাঁদ একান্ত অবলম্বনশূন্য ও পথের কাঙ্গাল হইয়া পড়িল। কিন্তু দুঃখের পাথারে ভাসিয়া সে যখন হাবুডুবু খাইতে লাগিল, তখন অনাথশরণ দয়াময়ের আদেশ ইঙ্গিতেই যেন এক মহাশয় ব্যক্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্নেহসম্ভাষণে কহিলেন, “ভয় কি বৎস, সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া হতাশ হইতেছ কেন? উহা এই আছে, এই নাই! আল্লার নাম স্মরণ করিয়া শোক-দুঃখ সব ভুলিয়া যাও, এবং যদি শ্রেয়ঃ বোধ হয় আমার সঙ্গে আসিতে পার।” বালক আশ্বস্ত হইয়া অসঙ্কোচে মহাশয় ব্যক্তির অনুগমন করিল। এইরূপে সে অসময়ে অকূলে কূল পাইল।

এই মহাশয় ব্যক্তি কে?—ইনি আমাদের গঙ্গারাম দেবশর্ম্মা। নিষ্ঠাবান্ আচারশুচি ব্রাহ্মণ হইয়াও ইনি মুসলমান

বালককে স্বগৃহে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না ; মুসলমান বালকও হিন্দুর আশ্রয়ে যাইতে কোন দ্বিধা বোধ করিল না।

সেকালে হিন্দু-মুসলমানে এমনই অভিন্নভাব ছিল! পরস্পরের শোক-দুঃখে পরস্পরে এমনি সহানুভূতি প্রকাশ করিত! হায়! আর এখন হিন্দু-মুসলমানেরা দা কুমড় সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়া আছে। হিন্দু অপকৃষ্ট হিন্দুত্বের ভাণে বলিতেছে,—

“পেঁজ-রসুনের গন্ধ গায়,
ছুঁইবি যদি স্নান করে আয়।”

আবার মুসলমান হাদিসের (ধর্ম্মশাস্ত্রের) দোহাই দিয়া বলিতেছে,—

“মালাউন কমজাত অপকৃষ্ট জাতি
মিলনে তাদের সহ নাই অব্যাহতি।”

কি ভীষণ কথা! কিন্তু কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন উৎকট জাতিবিদ্বেষের কথা নাই। হায়! এইরূপ মন্দভাব আমাদের দেশ হইতে কবে দূর হইবে? কবে আমরা মানুষ হইতে পারিব?

আমাদের সমাজ-তত্ত্বের পল্লবগ্রাহী মহাশয়েরা, আজ কাল সহরে বন্দরে দুই চারিজন হিন্দু-মুসলমানের এক আধটুকু মেশামিশি দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া বলিতেছেন, এইত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের যুগ আসিয়াছে, এই ত আমরা মানুষ হইতে চলিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা যদি অনুগ্রহপুরঃসর দু পা হাঁটিয়া মফঃ-

স্বলের হিন্দু-মুসলমানের কার্য্যকলাপ ও ভাবাভাব চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান পাইবেন না। যাহাতে উভয় জাতির মঙ্গল হইতে পারে পরস্পরে এমন সহানুভূতি সহরেই বা কোথায়? আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল স্কুল-কলেজের হিন্দু-মুসলমান-ছাত্রগণের ব্যবহার দেখিলেই এ বিষয়ে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। একাসনে বসিয়া এক ওস্তাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র উপদেশ লাভ করিতেছে, ইহাতে উভয়জাতীয় ছাত্রের মধ্যে পরস্পর গভীর সহানুভূতি ও অকৃত্রিম হৃদ্যতা থাকা উচিত, কিন্তু তাহা আছে কি? পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ছাত্রাবাস, কিন্তু হিন্দু ছাত্র আলাপ-পরিচয় করিতে তেমন ভাবে মুসলমান ছাত্রাবাসে যায় না, মুসলমান ছাত্রও হিন্দু-ছাত্রাবাসের নিকট দিয়া বড় ঘেঁসে না। এমন কি, একই স্নানের ঘাটে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র সমবেত হয়; কিন্তু অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে মেশামিশি আলাপ-পরিচয় উভয়জাতীয় ছাত্রের মধ্যে দেখিয়াছ কি? আলাপ-পরিচয় যে একেবারে না হয় তাহা নহে, কিন্তু যেটুকু হয় তাহা যেন কেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়ার মত অনিচ্ছাজাত ও অনন্তরঙ্গ। সুতরাং তাহা দেশের মঙ্গলের পক্ষে উপযোগী নহে।

আমরা চাই প্রত্যেকের ধর্ম্মে বাস্তবিক যেটুকু নিষেধ-বিধি আছে, তাহা মানিয়া চলিয়া হিন্দু মুসলমান ছাত্র ভাই ভাই গলায় গলায় মিশিয়া যাও; এক বিছানায় উঠা-বসা কর, আলাপ-পরিচয়ে পরস্পরের পারিবারিক কুশল অবগত হও, ছুটির পর

একে অন্তের বাসায় যাও, মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ আহ্লাদ কর। লম্বা ছুটির সময় হিন্দু ভাই মুসলমান ভাইকে, মুসলমান ভাই হিন্দু ভাইকে অবস্থা বুঝিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া যাও; বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাইএর পরিচয় করিয়া দাও। একের আধি-ব্যাধি অসুখ-অশান্তি নিবারণে অন্যে দেহ-মন নিয়োজিত কর; আর অন্তিমে পরস্পারে কবর বা চিতায় শবের সম্মানার্থে অনুগমন কর। এইরূপে একের দয়া, প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী, মঙ্গলেচ্ছার বীজ অন্যের হৃদয়ে বপন কর। দেখিবে সেগুলি যখন নিত্য মিলামিশায় সুরঞ্জিত ফলফুলে শোভিত হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ সুদৃঢ় ভাবে উভয়ের হৃদ্যতা জন্মিয়া যাইবে, তখন আমার পায়ে কাঁটা ফুটিলে তুমি উঃ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, বা তোমার গালে কেহ চড় দিতে উদ্যত হইলে আমি সেখানে গাল পাতিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইব না। ফলতঃ যখন তোমাতে আমাতে এইরূপে এক হইয়া এক অপূর্ব্ব মহান্ ভাবের সৃষ্টি করিবে, তখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গল, প্রকৃত উন্নতি হইবে।

যাহা হউক, ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়া আর পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাহি না। এক্ষণে ঠাকুর-পরিবার ও চাঁদের প্রসঙ্গই পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিতেছি।

ঠাকুর মহাশয় চাঁদকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে আনিলেন, মহামায়া চাঁদকে দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ ত সুন্দর ছেলেটি!" স্বামীকে কহিলেন, "তুমি ইহাকে কোথায় পাইলে?"

ঠা। ছেলেটি অনন্যগতি। তোমার শ্যামা, ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণ অভাবে তেমন আর দুধ দেয় না, তাই এস্‌লামাবাদ হইতে ছেলেটিকে আনিয়াছি, ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিবে; এ এতিম। (১)

এই সময় জীবন্ত কুসুম-কলিকাবৎ সাত বৎসরের একটি বালিকা, নাচিতে নাচিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং বালককে অনিমিষে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে তাহার পিতাকে কহিল, “বাবা এ কে?”

ঠা। এ তোমার এক ভাই, ইহাকে ভালবাসিবে।

বালিকা অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল, “হাঁ বাবা, খুব ভালবাসিব।” এই বলিয়া সে বালকের মুখের দিকে আবার তাকাইল। বালক যেন তাহার কত কালের চেনা এইরূপ ভাবে শেষে সে বালকের হাত ধরিয়া কহিল, “ভাই, তোমার মাথায় ওটা কি?” চাঁদের মাথায় তখন একটা লাল ইরাণী টুপী ছিল। সে বালিকার কথার উত্তরে কহিল, “টুপী।”

বালিকা কহিল “আমার বাবারও টুপী আছে। সেটার চেয়ে তোমারটাই ভাল।” চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, বাদসাহী আমলে হিন্দুরাও টুপী ব্যবহার করিতেন। এখনও উত্তর পশ্চিম ভারতের হিন্দুরা কিস্তিটুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন। টুপী মাথায় থাকায় চাঁদের আর জাতের পরিচয় আবশ্যক হইল না। মহামায়া কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা তোমার নাম কি?”

---

(১) মাতাপিতৃহীন।

বালক বলিল "চাঁদ।" মহামায়া চাঁদ নাম শুনিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন, "বাছা, তোমার আর কোন নাম নাই কি ?"

বালক। আছে। আমার বাবাজান হাসন নাম রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মা আমাকে চাঁদ বলিয়া ডাকিতেন। তাঁর দেখাদেখি সকলে আমাকে চাঁদ বলে।

মহা। তা বলুক; আমরা তোমাকে হাসন বলিয়া ডাকিব।

ঠা। (সরলতাপূর্ণমুখে) কেন, মাতৃদত্ত নামে দোষ হইল কি ? বিশেষতঃ সকলে যে নামে ডাকে সেই নামে ডাকাই উচিত।

মহামায়া কি যেন বলিতে যাইয়া থামিয়া গেলেন।

চাঁদ এই সময় বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেল। দেখাদেখি তারাও বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্যে নূতন ভাইএর পাছে পাছে ছুটিল।

মুখপোড়া বিদূষকের মত পদ্মা তখন কহিল, "বেশ মজাই হইবে। মেয়ের নাম তারা, চাকরের নাম চাঁদ। আরও মজা হইত, ছেলেটি যদি বামুণের হত, আর আপনারা যদি তাকে তারার সঙ্গে বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিতেন, তবে চাঁদের তারা বলিয়া আমি মেয়েকে ক্ষেপাইতাম।

ঠা। (ঈষদ্ধাস্যে) গর্ভস্রাবীর কথা শুন!

মহা। ও পোড়ারমুখীর মুখে কি কিছু আট্‌কায় ? পরে

মহামায়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “ছেলেটি আমাদের হাতে খাইবে ত ?”

ঠা। ছোট ছেলে, তাও অনন্যাশ্রয়, খাইবে বই কি ?

যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল ; যথাসময়ে চাঁদের আহারের ডাক পড়িল, চাঁদ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, মহামায়া পদ্মাকে কহিলেন, “ছেলেটিকে পূর্ব্বদ্বারী ঘরের সম্মুখে বসিতে দিয়া ভাত লইয়া দেও।” চাঁদ ভাতের কথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অধোবদনে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠাকুর মহাশয় তাহার অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন, “চাঁদ! তুমি কি আমাদের হাতে খাইবে না ?”

চাঁদ বলিল “আজ্ঞে, আমি কোরাণ-শরিফ ও মস্‌লার (১) কেতাব পড়িয়াছি এবং নামাজ পড়ি।” সে কালে মুসলমান-সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা ইহাই ছিল।

মহানুভব ঠাকুর মহাশয় শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ভাবিলেন, ‘অতটুকু ছেলে, তাও দীনহীন কাঙ্গাল, তথাপি স্বধর্ম্মে এমন আস্থাবান্, সুখের বিষয় বটে।’ তিনি আরও ভাবিলেন, ‘যে বালক এ বয়সে স্বধর্ম্মে এমন আস্থাবান, সে কখন অবিশ্বাসী বা মন্দচরিত্রের হইতে পারে না। আমি একক মানুষ, আমার সংসারে এই বালক উপযুক্ত চাকর হইতে পারিবে, কিন্তু ইহার

---

(১) ন্যায়শাস্ত্রের পুস্তক, যে কেতাবে নামাজ রোজা হালাল হারাম প্রভৃতির মীমাংসা আছে।

আহারের বন্দোবস্ত করা যায় কিরূপে?' প্রকাশ্যে কহিলেন, "বাছা আমাদের হাতে খাইবে না, এখন উপায় কি?"

চাঁদ। আমি পাক করিতে জানি।

ঠা। (সহর্ষে) বেশ, বেশ; তা হ'লে, তোমার পাকের বন্দোবস্তই করিয়া দেওয়া যাক্।

অতঃপর ফুলবাগানের নিকটে পুষ্করিণীর পারে চাঁদের রান্না-ঘর, এবং চণ্ডীমণ্ডপের অদূরে অন্দরসংলগ্ন স্থানে তাহার বাসের ঘর প্রস্তুত হইল।

চাঁদ শ্যামার রক্ষণ-পালনের ভার গ্রহণ করিল। অতি বিশ্বস্তভাবে হাট-বাজার, ও বাগানের ফলমূল বিক্রয় করিয়া ঠাকুর মহাশয়ের সংসারের বাজেখরচ চালাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে ঠাকুর মহাশয় একজোড়া হালের গরু খরিদ করিয়া চাঁদকে আনিয়া দিলেন।

পদ্মা গরুর নামকরণ করিল—একটির নাম কানাই, অপরটির নাম বলরাম। পদ্মা বৃন্দাবনবাসী জনৈক সদ্‌গোপের কন্যা। ঠাকুর মহাশয় সেই তীর্থক্ষেত্র হইতে ইহাকে আমদানী করিয়া পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। পদ্মা হয় কানাই-বলরাম দেবতার উপর যে কোন কারণে রুষ্ট, না হয় সে গো-দেবতার পরম ভক্ত, তাই দেবতার নামে গরুর নামকরণ করিল।

যাহা হউক, চাঁদ সেই গোধনদ্বয় খাটাইয়া নিপুণভাবে ঠাকুর মহাশয়ের নিষ্কর ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার কার্য্যদক্ষতায় ও সদ্ব্যবহারে অল্পদিনেই ঠাকুর-পরিবার মুগ্ধ হইয়া উঠিল।

এইরূপে উদারমতি স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগৃহে দীনহীন পথের কাঙ্গাল পাঠান-বালকের সংসার-অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু কে জানে ইহার অভিনয় দর্শকের চিত্তাকর্ষক হইবে কি না? কে জানে এই বালক কালে সংসার-নাট্যশালায় কোন অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে কি না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চাঁদের সহিত তারার মেশামিশি।

জীবমাত্রই স্বভাবতঃ আসঙ্গলিপ্সু ; তন্মধ্যে মানুষ যেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সঙ্গ-প্রিয়। আবার বয়সের সাদৃশ্য ও সৌন্দর্য্য আসঙ্গ-লিপ্সার প্রিয়তম ভোগ। তারা ঠাকুর-পরিবারে একমাত্র কন্যা। মিলিয়া-মিশিয়া খেলিবার তাহার তখন আর ভাই ভগ্নী হয় নাই ; কথা বলিবার, আমোদ আহ্লাদ করিবার জনক-জননী ও পদ্মা ছাড়া তাহার আর কেহ ছিল না। প্রতিবাসী বালক-বালিকাদিগের সঙ্গলাভের সুযোগ তাহার বড় ঘটিত না। তখন ভারতে এত ঘন বসতি ছিল না। তাই পরমসুন্দর চাঁদকে পাইয়া তারার আসঙ্গলিপ্সা যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। চাঁদের দর্শনে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। চাঁদের সহিত কথোপকথনে, গল্পগুজবে, আমোদ আহ্লাদে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুখানুভব করিতে লাগিল ; চাঁদ যতক্ষণ মাঠে থাকে ততক্ষণ বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে ; শত বার বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাহার আসা-পথপানে তাকাইয়া থাকে ; শেষে হতাশ হইয়া বাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। মাঠে থাকার সময়টুকু সে চাঁদের দীর্ঘবিরহ মনে করিয়া বিষণ্ণ হইয়া

পড়ে। কখন মাকে জিজ্ঞাসা করে 'ভাই কি আর আমাদের বাড়ীতে আসিবে না ?' কখন পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করে 'ভাই এত বেলা মাঠে থাকে কেন ?' মা বিরক্তির ভাণে যা-তা বলিয়া উত্তর দেন। পদ্মা সুরসাল উত্তর দানে বালিকাকে পরিতুষ্ট করে। যথাসময়ে চাঁদ মাঠ হইতে ফিরিলে বালিকা ঝাঁপাইয়া গিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্নপ্রসঙ্গে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে। মধুরস্বভাব চাঁদ মৃদু মধুরে উত্তর দান করিয়া বালিকার পরিতোষ বিধান করে।

গ্রীষ্মকালে যখন বাগানে বৃক্ষসমূহ ফলভরে অবনত হইতে থাকে, তখন তারার মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। যখন বায়ু-কোণে কালবৈশাখীর কোলে বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, আস্তে আস্তে বাতাস বহিয়া ক্রমে ঝড়ের সূচনা করিয়া দেয়, তখন তারা ময়ূরীর ন্যায় বসনাঞ্চল-কলাপ বিস্তার করিয়া নাচিতে নাচিতে ধামা কক্ষে লইয়া চাঁদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হয় এবং হর্ষব্যাকুল-চিত্তে বলে—

"আম কুড়াব আমরা দুজনে
ধামা এনেছি ভাই,
মেঘের কোলে খেল্‌ছে তড়িৎ
চল বাগানে যাই।"

চাঁদ তখন হাসিমুখে মালকোঁচা মারিয়া তারার মুখে পদ্মার রচিত কবিতা শুনিতে শুনিতে বাগানে যাইয়া উপস্থিত হয়। ঝড়ের আঘাতে যখন ধপাস্ ধপাস্ করিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আমগুলি মাটিতে পড়িতে থাকে, তখন তারা ও চাঁদ জড়াজড়ি

কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা তুলিয়া ধামা পূর্ণ করে। এইভাবে চাঁদের সহিত আম-কুড়াইতে তারা যে কত আনন্দ পায় তাহা তারাই জানে।

যাহা হউক, এমনি ভাবে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের সাময়িক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া তারার সুশোভন কৈশোর কাল অতিবাহিত হইয়া ক্রমে তাহার নবীন জীবনোদ্যানে যৌবন-কুসুম-কলি স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম অঙ্কুরিত।

একদিন নিদাঘের অপরাহ্ণে, তারা তাহাদের পুকুরে গা ধুইতে নামিয়া বালিকা-স্বভাবসুলভ কৌতূহলবশে কলসী-আশ্রয়ে সন্তরণ দিতে দিতে হঠাৎ কলসী সরিয়া পড়ায় সে জলে ডুবিয়া পড়িল।

চাঁদ তখন পুকুর হইতে জল তুলিয়া শ্যামাকে দিতেছিল। তারা যে জলমগ্ন হইয়াছে, চাঁদ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরে বিপর্য্যস্ত শূন্যকলসী জলতরঙ্গে সঞ্চালিত হইতে দেখিয়া বুঝিতে পারিল, তারা জলে ডুবিয়াছে। তখন সে চীৎকার করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চীৎকার শুনিয়া পদ্মা দৌড়াইয়া আসিল। মহামায়াও 'কি হইল' বলিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। চাঁদ জলে ডুবিয়া ডুবিয়া তারাকে তুলিয়া পারে লইয়া আসিল এবং নানা কৌশলে ঝাঁকাইয়া তাহার উদরস্থ জল বাহির করিয়া ফেলিল। তারা রক্ষা পাইল। মহামায়া কহিলেন, "ভাগ্যে চাঁদ ছিল, তাই মেয়ে ফিরিয়া পাইলাম।"

পরদিন তারা কথাপ্রসঙ্গে চাঁদকে কহিল, "আচ্ছা, ভাই, আমি যদি কা'ল মরিয়া যাইতাম, তুমি কি করিতে?"

চাঁদ। দিদিমণি, আর কি করিব? কান্নাকাটি করিয়া শোক প্রকাশ করিতাম।

তারা মুখ ভার করিয়া কহিল, "তবে তুমি আমাকে ভালবাস না ?". পরক্ষণেই সে ছুটিয়া পলাইল। চাঁদ হাবা ছেলের মত হা করিয়া চাহিয়া রহিল।

আর একদিন তারা পুকুরে জল লইতে আসিয়া দেখিল, নানাবিধ ফুল ফুটিয়া পুকুরে শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। পদ্মিনী দয়িত-করস্পর্শে যেন হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। তারা চাঁদকে ডাকিয়া কহিল, "ভাই, আমাকে একটা পদ্ম তুলিয়া দাও।" পুষ্করিণী বৃহৎ, পদ্ম দূরে ফুটিয়া আছে। চাঁদও দূরসন্তরণে বিশেষ পটু নহে, তথাপি দিদিমণির আবদার রক্ষা করিতে হইবে, তাই সে সন্তরণ দিয়া পদ্ম তুলিতে গেল। তারা তীরে দাঁড়াইয়া। চাঁদ পদ্ম লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কিছু অবসন্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তারা ভাবিল চাঁদ বুঝি ডুবিয়া মরে। সে বিলম্বমাত্র না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চাঁদ তারাকে পুনরায় জলে পড়িতে দেখিয়া উত্তেজিত বলে সন্তরণ দিয়া কূলে আসিল এবং সেই অবস্থাতেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পরে তীরে আসিয়া কহিল, "ছি! দিদিমণি এমনও করিতে আছে ? সেদিন তুমি ডুবিয়া মরিতেছিলে, আজ আবার জলে ঝাঁপ না দিলে কি পদ্ম পাইতে না ?" চাঁদ ভাবিয়াছিল হাত বাড়াইয়া পদ্ম লইবার নিমিত্তই তারা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল। তারা চোখ রাঙ্গাইয়া অভিমানের সুরে কহিল "আমি বুঝি পদ্মের জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম !"

চাঁদ। তবে কি জন্য ?

তারা। তুমি যে ডুবিয়া মরিতেছিলে ? তুমি মরিলে বুঝি আমি বাঁ……। বালিকার কণ্ঠনালী জড়ীভূত হইয়া আসিল। অনেক কষ্টে ঢোক গিলিয়া সে উপরে উঠিয়াগেল।

চাঁদ স্বহস্তে পাক করিয়া খায়। পদ্মা তাহার চাউল দাল তৈল লবণ প্রভৃতি সিধাপত্র গোছাইয়া দেয়। কিছুদিন পরে তারা আবদার করিয়া এ কার্য্যভার নিজে গ্রহণ করিল। চাঁদ যখন মাঠ হইতে ফিরিয়া আইসে তারা তখন সিধাপত্র লইয়া তাহার পাকঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ কার্য্যে তাহার কত আনন্দ। চাঁদ পাক করিতে আরম্ভ করে, তারা তাহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতে থাকে। গল্প এইরূপ—'তুমি আসার পর হইতে আমাদের শ্যামার খুব দুধ হয়। বাবা মার কাছে তোমার কত সুখ্যাত করেন। মা বলে ছেলেটি দেখিতে যেমন সুন্দর, স্বভাবটি তেমনই মনোহর।'

একদিন তারা চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, এতিম কাকে বলে ? তোমার কথা উঠিলেই বাবা মাকে বলেন, ছেলেটি এতিম, উহাকে স্নেহ-দয়ার চক্ষে দেখিও। আমি তাঁহাদের কথায় কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

তারার কথা শুনিয়া চাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই ফোঁটা চোখের পানি অপাঙ্গ বহিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। তারা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ভাই কাঁদিতেছ কেন ?"

চাঁদ। দিদিমণি, এ দুনিয়ায় যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই সেই এতিম।

তারা। তোমার কি মা বাপ নাই?

চাঁদ। না।

তারা। বাড়ীঘর?

চাঁদ। তাও নাই।

বালিকা শুনিয়া অনেকক্ষণ আর কথা কহিল না। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "তোমার আর ভাই বোন নাই?"

চাঁদ। তোমার মত আমার এক বোন ছিল। বাবাজান তাহাকে এক সিপাহীর সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পর সিপাহী-সাহেব তাহাকে দিল্লীতে লইয়া গিয়াছেন। তাহার পর তাহার আর খোঁজ খবর নাই।

তারা। সে কতদিনের কথা?

চাঁদ। অনেক দিনের।

তারা। তোমার ভগিনী দেখিতে কেমন ছিল?

চাঁদ। তোমার মত সুন্দর ছিল।

তারা। আমাকে কি সুন্দর দেখায়?

চাঁদ। হাঁ, আমার বোন পরিবানু আর তোমার মত খুবছুরত বালিকা আমি আর কোথাও দেখি নাই।

তারার মুখ যেন কি ভাবিয়া লজ্জারক্তিম হইয়া উঠিল। সে তথা হইতে তখনি সরিয়া পড়িল।

একদিন চাঁদ মাঠ হইতে বাড়ী আসিল, তারা সিধা লইয়া তাহাকে দিতে গেল। যাইয়া দেখে চাঁদ রান্নাঘরে নাই। তারা সিধা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দেখিল চাঁদ বাগান

হইতে একবোঝা জ্বালানী কাঠ মাথায় করিয়া লইয়া আসিতেছে। একে রৌদ্রে তাতিয়া মাঠ হইতে আসিয়াছিল, তাহার উপর কাঠ ভাঙ্গিতে পরিশ্রম হইয়াছে। সে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বোঝা আনিয়া পাকঘরের সম্মুখে নামাইল।

তারা কহিল "পদ্মমাসী কি তোমাকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া দেয় না?"

চাঁদ কহিল "প্রথম তুইচারি দিন দিয়াছিল, এখন আর সে সময় পায় না।" পদ্মার প্রতি রাগ হওয়ায় তারার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে সিধা রাখিয়া চলিয়া গেল।

চাঁদ আহারান্তে তাহার শয়নঘরে বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় তারা আসিয়া কহিল, "ভাই, আমাকে একখানি আকর্ষী প্রস্তুত করিয়া দাও।"

চাঁদ। দিদিমণি, আকর্ষী দিয়া কি করিবে? এখনতো গাছে আম পাকে নাই?

তারা। আমার দরকার আছে, তুমি প্রস্তুত করিয়া দাও না!

চাঁদ সুন্দর মজবুত একখানি আকর্ষী প্রস্তুত করিয়া তারাকে দিল। ইহার কয়েকদিন পর, চাঁদ ইন্ধনের নিমিত্ত আবার উদ্যানে প্রবেশ করিল। দেখিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তুই তিনটি রসালমূলে বনপাদপের ভগ্নশাখা সকল স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। চাঁদ ভাবিল পদ্মা পাকের জন্য রাখিয়া দিয়াছে। সে নিজ পাকের জন্য তাহার কতকগুলি বোঝা করিয়া লইয়া আসিল। তারা সিধা

দিতে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ জ্বালানী কাঠ কোথা হইতে চুরি করিলে ?"

চাঁদ। চুরি করি নাই। আমাদের বাগান হইতে আনিয়াছি।

তারা। নিজে ভাঙ্গিয়া আনিয়াছ ?

চাঁদ। না ; কে যেন গাদা দিয়া রাখিয়াছিল।

তারা। বলত কে রাখিয়াছিল ?

চাঁদ। আমি ত মনে করিয়াছি পদ্মামাসী রাখিয়াছিল।

বালিকা শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। চাঁদ অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তবে কে রাখিয়াছিল ?"

তারা কহিল "বলিব না।" চাঁদের তখন মনে হইল, কয়েকদিন হইল সে তারাকে আকর্ষী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে ; তাই সে ভাবিল নিশ্চয় বালিকা সেই আকর্ষী দিয়া কাঠ ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছিল। সে তখন প্রকাশ্যে কহিল, "দিদিমণি, তাহা হইলে এই কাঠ তুমিই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলে ? কিন্তু ইহা ভাল কর নাই। চাকরের জন্য মুনিব-কন্যার এতখানি করা ভাল দেখায় না। মা শুনিলে বকিবেন।"

তারা সুমধুর বিনীতস্বরে কহিল, "মা আমায় বকিবে না। আমি আর মা, বাবার নিকটে রোজ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ শুনি। বাবা মাকে বুঝান—'পুরুষ হউক আর স্ত্রীলোক হউক সাধ্যানুসারে লোকের উপকার করিবে। পরোপকার সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম।'

এ পর্য্যন্ত চাঁদ তারার মুখের দিকে চাহিয়া কখন কথা বলে

নাই। আজ সে উৎফুল্ল হইয়া তারার মুখের দিকে চাহিল। চোখে চোখ পড়ায় সহসা তারার আকর্ণমূলগণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

তারার এরূপ ভাব ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই একবার প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠক জানেন। কিন্তু চাঁদ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিত না বলিয়া সে তাহা লক্ষ্য করে নাই; আজ লক্ষ্য করিল। তাহার অভ্র-শুভ্র-নির্ম্মল-হৃদয়াকাশে একটা অস্পষ্ট তড়িৎ-রেখা বিকাশেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চাঁদের যৌবনকাল।

চাঁদ ক্রমে বিংশতিবর্ষীয় যুবক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দেহের বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ, অপিচ মুক্তাফলোপরি তরল ছায়া-সন্নিপাতজনিত লাবণ্য যেরূপ মনোরম, তদ্রূপ স্নিগ্ধ ও প্রীতিপ্রদ। সুগোল উত্তমাঙ্গ তৈলমসৃণ কুঞ্চিত কেশদামে শোভিত; পরন্তু এই কেশরাশি নাসিকার সহিত একরেখায় শিরোমধ্য দিয়া যেন স্বর্ণসূত্রে সূক্ষ্ম অথচ পরিস্ফুট ভাবে সমদ্বিধাকৃত হইয়া কম্বুগ্রীবা স্পর্শ করিয়াছে। পরে তথা হইতে নবিরসোন্নত (১) আদায় করিতে যেন তাহা কোঁকড়াইয়া কোঁকড়াইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, সায়ং-সূর্য্যের সোণালী কিরণ-রেখার উপর অলকস্তূপ মেঘের মালা শোভা পাইতেছে। উন্নত ললাট যেন কোন ভাবী সৌভাগ্যগরিমার ছায়াসন্নিপাতে প্রদীপ্ত। বৈশাখী মেঘের ন্যায় কজ্জলকৃষ্ণ ও প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় সুবঙ্কিম যুগ্মভ্রূ, গোলাপদলবৎ সুধীর-

---

(১) হজরত মোহাম্মদের গ্রীবাস্পর্শিত বাবরী চুল ছিল। তাহার অনুকরণের নাম এস্থলে নবিরসোন্নত।

নতোত্তোলিত নয়নপল্লব শতদলপর্ণোপম আকর্ণবিস্তৃত। অক্ষি-তারকা কৃষ্ণোজ্জ্বল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব জলদপ্রতিবিম্বিত অভ্রের ন্যায় নীলাভ। বঙ্কিম উন্নত নাসিকায় শিল্পীর গঠন-ভঙ্গিমাকৌশল চমৎকারিত্বের চরম অভিব্যক্তি। দাড়িম্বকুসুমপর্ণ-বর্ণবৎ ওষ্ঠাধরের স্ফুরণে কখন কখন কুন্দশুভ্র দন্তের বিকাশ দেখা যায়, তখন মনে হয় দামিনীগর্ভে চাঁদের আলো বিরাজ করিতেছে। বাহুদ্বয় দেহায়তনরূপে গঠিত ও দীর্ঘ এবং গন্ধকদণ্ডসম সুদৃঢ় ও মৃণালদণ্ডসম কোমল; পরন্তু তাহা অংস-সন্ধি হইতে ক্রমসূক্ষ্ম। হস্ত-তালু রক্তোৎপলসদৃশ মনোহর ও নবনীতবৎ কোমল। নখপৃষ্ঠ মুকুরবিম্বিত। বিশাল বক্ষঃ কোমল মাংসপূরিত। মাংসল গুরুভার জানুদ্বয় নবীন রামরম্ভা-দ্রুমের এবং মৃত্তিকাস্পর্শিত চরণদ্বয় করিযুবক-পদদ্বয়ের সহিত তুলিত। ফলতঃ চাঁদ সৌন্দর্য্যস্রষ্টার অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের অতুলিত জীবন্ত আলেখ্য। চাঁদকে দেখিলে হজরত ইউসফের কথা মনে পড়ে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তারার ভরাযৌবন ও বিষম পরিবর্ত্তন।

পূর্ণযৌবনের সকলই সুন্দর দেখায়; সকলই মনোমদ, প্রীতিপ্রদ ও প্রাণারাম দর্শনধারী হইয়া উঠে। যৌবনের নিশ্বাসে সুধীর বসন্ত-সান্ধ্য-সমীরণ-সঞ্চালিত-পুষ্পগন্ধ অনুভূত হয়, বচনে সঙ্গীতের অমৃতধারা বর্ষণ করে। যৌবনের দৃষ্টি আয়তনয়ন মৃগের চাহনি চাঞ্চল্য-বিজয়ী, গতি মদ-গর্ব্বিত দ্বিরদগতির ন্যায় সুধীর-দ্রুত। যৌবনের স্নান-পান আহার-বিহার সুপ্তি-জাগরণে সুখের অমৃতধারা ক্ষরিত হয়। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই জগৎ আনন্দনিকেতন বলিয়া বোধ হয়।

তুমি জড়জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, যখন প্রকৃতির নেত্র-বারিসিক্ত নবীন দূর্ব্বার অঙ্কুরে বা সৈকতভূমির বালুকাকণায় নবারুণরশ্মিপাতে মুক্তাফল উৎপন্ন হয়, তখন তাহা দেখিতে কত মনোরম! যখন দিবা-প্রারম্ভে দয়িতকরস্পর্শে শতদল নয়নোন্মীলন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে তাহার পানে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে এবং রজনীযোগে কুমুদিনী প্রাণপতি চন্দ্রের বিশ্বশোভন সৌন্দর্য্য দর্শনে আত্মহারা হইয়া দুগ্ধশুভ্র

দল-বসনাবরণ উন্মুক্ত করত তাহাকে আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান দান করে তখন সে শোভা কত প্রাণ-তোষিণী!

যখন নবীনা ব্রততী সহকার-স্বামীর সহিত আত্মায় আত্মায় মিলনবাসনায়, তাহার শ্যামাঙ্গে আপনার কনকদেহ মিলাইয়া কোমল বাহুপল্লবপাশে তাহাকে জড়াইয়া ধরে, তখন সে প্রেমাভিনয় কত চিত্তবিনোদক!

আষাঢ়ের নবীন নীরদমোহিনী, যখন নীল গগনগৃহের বায়ুকোণে বসিয়া বায়ুচালিত, আলুলায়িত গাঢ়কৃষ্ণ কুন্তল-কবরী তড়িৎ-ফুলে শোভিত করে; যখন শ্রাবণের নবযৌবনা স্ফীতবক্ষাঃ তটিনী অষ্টমীর কৌমুদীকিরণ-পাতে কলধৌত বিমণ্ডিত হইয়া কুল কুল আরাবে প্রেমের সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রমাস্পদ সাগরসঙ্গমে প্রবাহিত হয়, তখন সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-সুধাপানে কাহার মন না আকৃষ্ট হয়?

আবার বর্ষায় আর্দ্রীভূতা প্রকৃতিসুন্দরী যখন শুভ্র শারদাম্বরে সুশোভিতা হইয়া নববিকশিত কাশকুসুম তুলিয়া উৎপলসুবাসিত সুধীর অনিলকে বিলাইতে থাকে, যখন শাক্তভক্তগৃহে পৌত্তলিক ধর্ম্মের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠে এবং তচ্ছ্রবণে গৃহের আনন্দপুত্তলি বালক-বালিকাগণ সহর্ষে "আঙ্গা কাপড় দে মা" বলিয়া তাহার অঞ্চল ধরিয়া আবদার করিতে থাকে, যখন কুলকামিনীগণের আবাহন উলুধ্বনিতে দিগন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন সেই জগন্মোহিনী নবীনা শারদ প্রকৃতি ভাবুকহৃদয়ে কত সুখ দান করে!

আবার যখন নবীন বসন্তরাগে বিজন বনস্থলী, শ্যামসবুজ পত্রাবলী-বসনে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া ফুলভূষণে শোভিত হইতে থাকে, যখন ঘুঘু সেই বনস্থলীশিরে বসিয়া স্বভাবগম্ভীর ঘুঘু-রবে প্রাণ মন উদাস করিয়া তোলে, কোকিলের কুহু তানে, শ্যামার শিস্‌দানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, ঝিল্লির চিক্কণস্বরে সেই বনস্থলী নিনাদিত হইতে থাকে, সর্ব্বোপরি যখন নীরবশান্তিদায়িনী যামিনীযোগে, সেই বনস্থলীর অদৃশ্যকেন্দ্রে থাকিয়া বুল্‌বুল তাহার প্রাণমাতান সঙ্গীতসুধায় শ্রবণবিবরে অমৃতের ধারা ঢালিতে থাকে, তখন বিশ্ব-প্রেমিক ভাবুক মনে করেন, অমরাবতীর নন্দনকানন আর কোন্ দেশে? ফলতঃ জড়প্রকৃতির যৌবন-সৌন্দর্য্য এমনই ভাবময়! এমনই চিত্তদ্রবকারী!

আবার প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে যৌবনের বন্ধুরদেহ পিপীলিকা অবধি কর্কশদেহ হস্তী পর্য্যন্ত প্রাণিগণ সুন্দর দেহ ধারণ করে। বিশ্রী কাকের দেহ যৌবনে তৈলমসৃণ চাক্‌চিক্যশালী হয়, কুকুর বিড়াল ইন্দুর বানর প্রভৃতি ইতর প্রাণিসকল যৌবন-সৌন্দর্য্যে ডগমগ করিতে থাকে। সর্ব্বোত্তম জীবরাজ মানুষের কথা আর কি বলিব?

এই সময় মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের সৌন্দর্য্য পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়। আমাদের তারার লাবণ্যশ্রী তাহার এই ভরাযৌবনে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বস্তুতঃ পুষ্পরাশির সমবেত গঠননৈপুণ্যে পুষ্পস্তবক যেমন সৌন্দর্য্যাধার হয়, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রস্ফুটিত রূপরাশিসমবায়ে তারা

তদ্রূপ পুষ্পস্তবকের ন্যায় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভাল ঘর, ভাল বর না পাওয়ায় এপর্য্যন্ত তারার বিবাহ হয় নাই। এত বয়সে বিবাহ না হওয়ায় তাহার মাতাপিতা চিন্তাকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন। আবার এই সময় তাহার জীবনের বিষম পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।—কৈশোরে কোকিলের ডাক শুনিয়া সে ‘কুউ কুউ’ করিয়া ভেঙ্গাইত, পাপিয়ার স্বর শুনিয়া ‘পিউ পিউ’ রব করিত; এখন সে তাহাদের সেই রব নীরবে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শ্রবণ করে, অলক্ষিতে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে, প্রাণ অনাহূত পুলকে ভরিয়া যায়, হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী আনন্দাবেশে বাদকের অঙ্গুলিস্পর্শে স্পন্দিত বীণাতন্ত্রীর মত চঞ্চল হইয়া উঠে। কৈশোরে সে যখন পূজার ফুল তুলিতে বাগানে প্রবেশ করিত, তখন ষট্পদের গুঞ্জরণে সেও গুণ্ গুণ্ করিয়া কত কি গাহিত এবং মধুকর পুষ্পবক্ষে সংলগ্ন হইয়া মধুপানে রত হইলে সে অঞ্চলতাড়নে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া লইত। এখনও সে বাগানে যায়, ফুল তুলে, সাজি ভরে, এবং ভ্রমরের ফুলবিহার সন্দর্শন কবে; কিন্তু ভাবে, ইহাদের মধ্যে কিবা সম্বন্ধ আছে। চিন্তার সহিত অলক্ষিতে তাহার সুবর্ণ ললাটফলকে মুক্তাফল উৎপন্ন হয়। তাহাদের পুকুরের জলে যখন চন্দ্রোদয়ে কুমুদিনী হাসে, আবার অরুণরাগে পদ্ম ফুটে, তাহা দেখিয়া সে ভাবে, কোথায় থাকে চন্দ্র সূর্য্য, আর কোথায় আছে কুমুদিনী পদ্ম, অথচ এমনটি হয় কেন? যখন গ্রীষ্মারম্ভে শন্ শন্ করিয়া বাতাস বহে,

গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মেঘ ডাকে, মেঘের কোলে বিজলী চমকে, তখন সে আর আগের ন্যায় ধামা কক্ষে করিয়া আম কুড়াইতে চাঁদ ভাইয়ের খোঁজে যায় না, গভীর চিন্তামগ্না হইয়া তাহার নির্জ্জন-পাঠাগারে প্রবেশ করে। তাহার জীবনে এমনি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহার হাসিতে এখনও কাশ-কুসুম ফোটে কিন্তু তাহা চাঞ্চল্যানিলে দিগন্তচ্ছুরিত হয় না; তাহার গমন কখন ধীর, কখন দ্রুত; ধীরগমনে অশান্তি, দ্রুতগমনে শঙ্কা তাহাকে পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। সে পরিহিত বসনের অত্যাচারে এখন সর্ব্বাপেক্ষা উপদ্রুত। গাত্রবসন যেন দুষ্টামি করিয়াই শতবার স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, শতবার সে সযত্নে তাহা তুলিয়া ধরে। পূর্ব্বে সে চাঁদের নিকট নিঃসঙ্কোচে অবাধে যাতায়াত করিত, নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে চাঁদের সহিত গল্পগুজব করিত, প্রতি কথায় চাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিত, অনাবিল স্বার্থশূন্য প্রীতি প্রকাশ করিয়া সুখানুভব করিত, যখন চাঁদ মাঠ হইতে বাড়ী আসিত, বহির্ব্বাটীতে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে বিশৃঙ্খলবস[illegible]ভূষণে, আলুথালু কবরীবন্ধনে তাহার নিকট দৌড়াইয়া আসিত, কিন্তু এখন? এখন তাহার নিকটে আসিতে যেন দারুণ লজ্জায়, নিদারুণ সঙ্কোচে তাহার হাত পা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ভৃত্য চরিত্রশালী ও একান্ত বিশ্বাসী, তাহার নিকট যাতায়াতে কথোপকথনে পিতামাতার নিষেধ নাই, তথাপি লজ্জা! তথাপি সঙ্কোচ! যৌবন তাহার এমনি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে!

এখন সে হৃদয়ের নিভৃত কোণে সর্ব্বদা কেমন যেন এক

জ্বালাময় মোহময় অভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কিসের অভাব, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অভাবের স্বভাব এইরূপ—কি যেন চাই, কি যেন নাই, কি যেন পাইলে সুখী হই। এই অভাব গুপ্তব্যাধির ন্যায় তাহার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও নিকট খুলিয়া বলিবার যো নাই। আবার যেমন-তেমন করিয়াই হউক কাহারও নিকট বলিবার ইচ্ছা করিলেও লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরে। তখন অভাব বাহিরে ফুটিতে না পারিয়া মিছরীর ছুরীর ন্যায় হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করে। হায়! এই অভাবজাত অবাক্-প্রকাশ্য ব্যাধির উপশম কিরূপে হইবে কে জানে? তবে আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত আছি, চাঁদের কণ্ঠস্বরে তারার এ ব্যাধির তীব্রতার হ্রাস হয়, দর্শনে উপশম আরম্ভ হয়। তাই এত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও চাঁদের সংশ্রবে না যাইয়া সে থাকিতে পারে না।

চাঁদ মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিলে সে পূর্ব্বের ন্যায় চাঁদের আহার্য্যসামগ্রী লইয়া তাহাকে দিতে যায়; নানা ভাণে চাঁদের প্রতি সহানুভূতিসূচক কত কথা বলে।

তারার এই মধুময়ী প্রাণারাম-দায়িনী প্রেমের লীলা প্রেমের-খেলার বিষয় যুবক চাঁদ যে না বুঝিত, এমন নয়। কিন্তু সে হজরত ইউসফের ন্যায় পরম সংযমী ছিল। তারার প্রেমভাব দিন দিন যতই পরিস্ফুট ইহতে লাগিল, চাঁদ ততই চাপিয়া যাইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের প্রকৃতি।

একদিন তারা চাঁদকে কহিল, "ভাই, তুমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া মাঠ হইতে আইস, তাহার উপর তোমাকে নিজহাতে পাক করিয়া খাইতে হয়; কিন্তু আমাদের পাকে খাইলে তোমাকে এত কষ্ট করিতে হইত না?"

ইতঃপূর্ব্বে তারা কথাপ্রসঙ্গে একবার চাঁদকে তাহাদের হাতে খাওয়ার কথা বলিয়াছিল। সেই সময় চাঁদ জনৈক আলেমকে, হিন্দুর হাতে হিন্দুর পাকে খাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আলেম সাহেব বলিয়াছিলেন, 'অনেক স্থলে দেখা যায়, হিন্দুর যাহা সুখাদ্য, আমাদের নিকটে তাহা হারাম; আবার আমাদের যাহা হালাল, হিন্দুর নিকট তাহা অখাদ্য। ফলতঃ আমাদের হালাল হারামের সহিত হিন্দুর খাদ্যাখাদ্যের ভালমন্দ খাপ খায় না। সুতরাং এমন অবস্থায় হিন্দুর পাকে ও হাতে আমাদের না খাওয়াই সঙ্গত। তবে অগত্যাবস্থায় হিন্দু যদি শুচিশুদ্ধ হইয়া আমাদের হালাল খাদ্য সাক্ষাতে পাক করিয়া দেয়, তাহা হইলে খাওয়াতে বিশেষ কোন দোষ হয়

না।' চাঁদ জানে তারা সর্ব্বদা শুচিশুদ্ধ পরিষ্কার পরিছন্ন থাকে, তাই সে আলেমের শেষ কথা স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তারাকে কহিল, "দিদিমণি, তুমি যদি নিজহাতে পাক করিয়া দাও, তবে একদিন খাই।" শ্রবণমাত্র অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে তারার মুখপদ্ম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মৃদুহাস্যে কহিল "বেশ, একদিন কেন আমি প্রত্যহ তোমাকে পাক করিয়া দিব।" সে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া সে সংবাদ তাহার মা ও পদ্মাকে জানাইল। তারা মূর্ত্তিমতী সরলতা।

মহামায়া শুনিয়া কহিলেন, "তাহা হইলেত ভালই হয়। পাক করিয়া খাইতে চাঁদের যে সময় নষ্ট হয়, সে সময়ে সে সংসারের অনেক কাজ করিতে পারিবে।" বাস্তবিক চাঁদের স্বপাক আহারে ঠাকুর মহাশয়ের সংসারের অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিত, কিন্তু উদারহৃদয় ব্রাহ্মণদম্পতি তজ্জন্য চাঁদকে কিছু বলিতেন না। নিজ স্বার্থের জন্য পরধর্ম্মে আঘাত করা তাঁহারা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন।

পর দিন আহারের সময় সিধা না লইয়া সত্যসত্যই একরাশি অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া তারা চাঁদকে দিতে আসিল। চাঁদ দেখিয়া কহিল "এ সব কি ?" তারা কহিল "কেন ? তুমিত আমার হাতে কা'ল খাইতে চাহিয়াছ ?" চাঁদ অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, শেষে কহিল, "দিদিমণি, সত্যই তুমি পাক করিয়াছ ?" তারা অভিমানস্ফুরিতাধরে কহিল, "আমি কখনও কি তোমার কাছে মিছা কথা বলিয়াছি ?" মিথ্যা কথা বলা তারা আদবেই জানে না, ইহা জানা সত্ত্বেও ধর্ম্মভীরু

চাঁদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তারা কহিল, "তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? আমি স্নান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াই তোমার পাক করিয়াছি। দেখ না, এখনও আমার মাথার চুল শুকায় নাই।" চাঁদ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে আজ আবার তারার মুখের দিকে চাহিল। দৃষ্টিমাত্র তাহার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল। কারণ পতিময়াত্ম পত্নী তাহার জীবনসর্ব্বস্ব পতির জন্য খাদ্যসামগ্রী লইয়া তৎসকাশে উপস্থিত হইলে, যেরূপ প্রেমানন্দে সতীর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে থাকে, এই সময় তারার মুখের অবস্থা সেইরূপ দেখাইতেছিল।

সংযমী ধর্ম্মভীরু চাঁদ অবিলম্বে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া অন্য চিন্তায় নিমগ্ন হইল। সে ভাবিতে লাগিল, তারা কি তাহার পিতার ন্যায় গণনা-বিদ্যা জানে? না হলে আলেম সাহেব কবে কোন্ অলক্ষিতে আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, সে তাহার ভাব গ্রহণ করিল কিরূপে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, তুমি আমার পাকের জন্য স্নান করিয়াছ কেন?" তারা কহিল, "তুমি তোমার নেমাজের সময় যেরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঢালিয়া হাত পা ধৌত কর; আহারের সময় যেরূপ খাদ্যসামগ্রী ও বাসনপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লও, তাহাতে আমার মনে হইল, অস্নানে পাক করিলে তুমি হয়ত খাইতে ইতস্ততঃ করিবে, তাই স্নান করিয়া পাক করিযাছি।" চাঁদ আর দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা করিল না। তারার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিল।

সময়ান্তরে চাঁদ তারাকে কহিল, "দিদিমণি, আমি জানি, মা বা কর্ত্তা তোমার দ্বারা গৃহস্থালীর কোন পরিশ্রমের কার্য্য করান না। তুমি শুধু আমার পাকের জন্য আগুনের তাত সহিবে কেন? ছোট বেলা হইতে আমার পাকের অভ্যাস আছে। অল্প সময়ের মধ্যে আমার নিজের পাক নিজেই করিয়া লইব। আমার জন্য তোমার আর ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই।" চাঁদের কথায় তারা কি যেন ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে মলিনমুখে কহিল, "হাঁ বুঝিয়াছি, রান্নাভাল হয় নাই, তাই ছলনা করিয়া খাইতে অস্বীকার করিতেছ।"

চাঁদ। না না, দিদিমণি তাহা নয়; আমি সত্যই বলিতেছি, পাক খুব সুন্দর হইয়াছিল, আমি পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়াছি। তবে তুমি মুনিব-কন্যা হইয়া প্রত্যহ আমাকে পাক করিয়া খাওয়াইবে, ইহা ভাল দেখায় না, তাই নিষেধ করিতেছি।

তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিতচিত্তে অন্দরে প্রবেশ করিল।

স্ফটিকস্বচ্ছ-কলতার-শুভ্র-নগনন্দিনী-নির্ঝরিণী যেরূপ অস্ফুট-মধুর ঝির ঝির আরাবে শত সংগোপনে শতপথ বহিয়া আসিয়া শেষে নদীরূপ ধারণ করে; পরে মন্দানিলধূনিত বীচিবিক্ষোভ-সঞ্জাত-ফেনপুষ্পমালা বক্ষে ধারণ করিয়া দয়িত-পয়োধিসঙ্গমে গমন করিতে থাকে, তারাও সেইরূপ মধুর বাল্যসংসর্গ, মধুর কৈশোরপ্রীতি, মধুর যৌবনসহানুভূতি-বশে, প্রেমময়ী নদীরূপে

চাঁদ-সাগরে আত্মবিসর্জ্জনে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু নদী কোথা হইতে কেমন করিয়া কত পথ বহিয়া কত উদ্যমে কত আবেগ-উচ্ছ্বাসে যে সাগরের সহিত মিলনাশে চলিয়া আইসে, তাহা যেমন সাগর জানে না, বা জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করে না, পরন্তু প্রশান্তচিত্তে নিজের কার্য্য করিয়া অনন্ত সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে থাকে, চাঁদও সেইরূপ তারার শনৈঃ পুরতঃ অপূর্ব্ব মধুরতাময় প্রেমাভিসারের বিষয় উপলব্ধি করিয়াও হৃদয়ে গ্রহণ করে নাই। গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও তাহার সংযতহৃদয়ে কখন প্রবুদ্ধ হয় নাই। খোদাতায়ালার উপাসনা ও ব্রাহ্মণ-প্রভুর মঙ্গল-কামনা তাহার বর্ত্তমান জীবনের ব্রত; সে একান্তমনে তৎ-সাধনেই রত।

চাঁদ সামান্য ভৃত্য হইলেও শিষ্টাচারে কুসুমবৎ কমনীয়, সংযমে বজ্রাদপি দৃঢ়, ধর্ম্মহানতাভয়ে সদা শঙ্কিত; সুতরাং এতাদৃশ অলৌকিক প্রেমাভিসারের বিষয় যে তাহার চিন্তার অতীত হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

তারার উদার-হৃদয় মাতাপিতাও এই প্রেম-লীলার বিষয় কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়ে আদুরে, তাহার দোষও তাঁহাদের নিকট গুণ বলিয়া বিবেচিত। আবার ভৃত্যের প্রতিও তাঁহাদের বিশ্বাস অগাধ—অচল। ভৃত্য কাহারও প্রতি মুখ তুলিয়া পর্য্যন্ত কথা বলে না, সুতরাং এ অলৌকিক লীলার ছায়া টুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রতি-

বিস্মিত হইতে পারে নাই। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ব্বথা সংশয়শূন্য। বাকী এখন পদ্মা। সে ব্রজের গোপী হইলেও উপস্থিত ব্যাপারে বুদ্ধিহারা হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, সে জানে, কৃষ্ণই রাধিকার প্রেম বাড়াইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্যাম-অঙ্গে পীতধরা পরিয়া শিখি-পালক-কিরীটে শিরঃ শোভিত করিয়া কদম্বমূলে বাঁশী বাজাইয়াছিলেন। সে জানে, কৃষ্ণই সখ করিয়া ব্রজনারীগণকে প্রেমে মাতাইতে, তাহাদের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষে তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এ কি? এ যে বিষম বিস্ময়াবহ বিপরীত লীলা! এ লীলার একদিকে গাঢ় মেঘের অন্তরালে বিজলীর খেলা, অন্যদিকে জগৎ নির্ব্বাত—নিষ্কম্প! একদিকে কুমুদিনীর বাপীবক্ষঃ-উদ্ভাসিত প্রেমপ্রফুল্ল ঢল ঢল চাহনী, অন্যদিকে নির্ম্মল গগনতলে জগৎ-বিমোহন সুধাংশুর শুভ্র অভ্র-বসনে বয়ানাচ্ছাদন! একদিকে প্রেমের অপরিসীম আবেগোচ্ছ্বাসে পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহ, অন্যদিকে দেবতার নির্লোভ ভ্রূক্ষেপশূন্যতা অথবা ব্রতকারিণীর অযাচিত উপায়ন গ্রহণে স্বর্গীয় সংযম-পরায়ণতা! কি বিষম বিসদৃশভাব! তাই গোপী পদ্মা এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিহারা হইয়া তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বিনী। তাই সে চাঁদের প্রতি তারার ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াও হৃদয়ে চাপিয়া যাইতেছিল। পরন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার হেতুও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সর্ব্বাধিক রহস্য, যে এই অপূর্ব্ব প্রেমাভিসারের মূলীভূতা, সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই, কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে সে চাঁদের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে! যাহা

হউক, এইরূপ দিনের পর দিন অতীতের গর্ভে বিলীন হইতে চলিল, তারার হৃদয়ও দিন দিন চাঁদময় হইয়া উঠিতে লাগিল। এখন চাঁদই তাহার ধ্যান, চাঁদই তাহার জ্ঞান, চাঁদই তাহার অস্তিত্বের নিদানস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সে চাঁদ ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না, কিছুই দেখে না। চাঁদের অভাবে তাহার জীবনধারণ যেন একান্তই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদ যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ সে নানা অছিলায় দূরে বা নিকটে, লক্ষিতে বা অলক্ষিতে থাকিয়া চাঁদের রূপ-সুধা পানে বিভোর থাকে। যখন চাঁদ মাঠে যায়, তখন নির্জ্জনে তাহার মনোমোহন-মূর্ত্তি ধ্যান করে। এইরূপ আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে চাঁদের মূর্ত্তি তাহার অক্ষিগোলক আলোকিত করিয়া রাখে।

চাঁদের হাঁচিতে সে অমঙ্গলাশঙ্কায় উৎকন্ঠিত হয়। কাশিলে চমকিয়া উঠে। চাঁদের গমন সে নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়া দেখে। সে নিষ্ঠাবান্ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ-দুহিতা হইলেও, নৈসর্গিক প্রেম-পরবশতায় চাঁদের পঞ্চবার নামাজ পড়া ও নৈশ কোরাণ পাঠ একান্ত পছন্দ করিয়া লইয়াছে। চাঁদ যখন 'আল্লাহোআকবর' বলিয়া নামাজে দণ্ডায়মান হয় এবং মোহন স্বরে সুরা পাঠ করিতে থাকে, তখন সে রব তারার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। চাঁদ যখন এসার নামাজ বাদ কোরাণ শরীফ পড়িতে আরম্ভ করে, তারা অদৃশ্যে থাকিয়া স্থিরকর্ণে তাহা শ্রবণ করে, আর ভাবে, বাবার সামবেদের গানও ত এত মধুর নহে! তারা প্রেমের কর্ণে প্রেমিকের মুখে শ্রবণ করে বলিয়াই যে কোরাণের

ভাষা মধুর তাহা নহে। বাস্তবিকই কোরাণের ভাষা ও উচ্চারণ-পদ্ধতি এমনি অমৃতময়ী ও চিত্তদ্রবকরী যে জগতে তেমন আর কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না।

একদিন তারা চাঁদকে কহিল,—"ভাই, তুমি যে নামাজে দাঁড়াইয়া সুর করিয়া বার বার 'আল্লাহোআক্‌বর' ও 'আলহাম্‌দো লিল্লাহেরবেরল আল আমিন' পড়, ঐ শব্দগুলির অর্থ কি?"

চাঁদ বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি এ সকল কথার উচ্চারণ কেমন করিয়া শিখিলে?" তারা অনুরাগের অভিমানে কহিল, "তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আগে তাহারই উত্তর দাও।" চাঁদ একটু অপ্রতিভ হইল, কিন্তু কহিল, আল্লাহোআক্‌বর মানে আল্লা সকলের বড় এবং আলহাম্‌দ মানে সকল প্রশংসা সেই আল্লার।

তারা। তোমাদের আল্লা কে?

চাঁদ। তোমরা যাহাকে ঈশ্বর বল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময়কেই আমরা আল্লা বলি।

তারা। তাহা হইলে দেখিতেছি, তোমাদের ধর্ম্মের সকল কথাই সুন্দর!

চাঁদ। হাঁ দিদিমণি, আমাদের ধর্ম্মের সকলি সুন্দর, কেবল এই অভাগাই অসুন্দর।

এই সময় একদিকে দুরদৃষ্টের কথা মনে করিয়া যুবকের ভুবনসুন্দর মুখমণ্ডল বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন হইতেছিল, অন্যদিকে অনুরাগের কমনীয় দীপ্তিপ্রভাবে যুবতীর সৌন্দর্য্যসার মুখপদ্ম

স্ফুটিত হইতেছিল। অহো! মেঘের পাশে সৌদামিনীর খেলা পার্থিব জগতে বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে!

তারা। ভাই, তুমি অত দুঃখ করিয়া কথা বলিতেছ কেন? তুমি যদি অসুন্দর, তবে জগতে সুন্দর কে?

চাঁদ। যে ভাগ্যবান!

তারা। বাবা বলেন, ভাগ্য ঈশ্বরের হাতে। আজ যে এক জনের ভৃত্য, কাল সে কোটি জনের প্রভু

চাঁদ। হাঁ দিদিমণি, আমাদের আলেমেরাও বলেন, সব খোদাতালার এক্তিয়ার। ভাগ্য আল্লাহতালার হাতে।

তারা। আলেম কাহাকে বল?

চাঁদ। (মৃদুহাস্যে) যাঁহারা কোরাণ হাদিস জানেন।

তারা। কোরাণ হাদিস কি?

চাঁদ। আমাদের নামাজ রোজা ধর্ম্মকর্ম্মের কথা যাহাতে লেখা আছে।

তারা। আচ্ছা ভাই, তোমার নামাজের মন্ত্রের অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার?

চাঁদ। আমি অর্থ জানি না।

তারা। কোন বিষয়ের অর্থ না জানিয়া পড়িতে কি ভাল লাগে?

চাঁদ। আমরা বিশ্বাস করিয়া নামাজ পড়ি। বিশ্বাসই আমাদের ধর্ম্মের মূল।

তারা। তুমি যে কখন কখন একখানা বড় পুস্তক পাঠ কর, ওখানার নাম কি?

চাঁদ। ঐ ত কোরাণ শরিফ।

তারা। উহার দুই চারিটি কথা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার?

চাঁদ। কোরাণ শরিফের অর্থ আমি পড়ি নাই, তবে মোটামুটি দুই চারিটি কথার অর্থ জানি।

তারা। বলত শুনি।

চাঁদ। আল্লা এক, তিনি ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা করিবে না। মিথ্যা কথা বলিবে না। মাতা-পিতাকে ভক্তি করিবে। রাগ হিংসা ত্যাগ করিবে, গরিব লোকের সাহায্য করিবে।

তারা। বেশত; তোমাদের আমাদের ধর্ম্ম প্রায় একরূপ! বাবাও বেদে আমাদিগকে প্রায় ঐরূপ ভাল কথাই বুঝান।

চাঁদ তারার কথার উত্তরে আর কিছু বলিল না। তারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাটীর দিকে চাহিয়া স্থিরচিত্তে কি যেন চিন্তা করিল। পরে উঠিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

——:0:——

লাঠিখেলা।

একদিন রাত্রিকালে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ ঠাকুর মহাশয় চাঁদকে ডাকিলেন; কিন্তু দুই তিনবার ডাকিয়াও তাহার কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। অগত্যা তিনি চাঁদের শয়নঘরের নিকটে যাইয়া দেখিলেন, সে ঘরে নাই। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। ঠাকুর মহাশয় তখন নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, চাঁদের স্বভাব কি মন্দ? নবীন যুবক, অসম্ভব কি? শেষে গৃহে যাইয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল চাঁদের স্বভাব তোমরা কিরূপ মনে কর?"

স্ত্রী। কেন?

ঠা। এত রাত্রে সে ঘরে নাই।

সরলা শুচিস্বভাবা মহামায়া কহিলেন, "কোথাও বা গিয়াছে, এখনি আসিবে।"

ঠা। তাহার ঘরের নিকটে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছি, শেষে বাড়ীর সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, কোথাও সে নাই।

মহা। ওমা! সে কি কথা? তাহার কাপড় চোপড় সব ঘরে আছে ত?

ঠা। সে সব ঠিক আছে।

মহা। তবে এতরাত্রিতে সে কোথায় গেল?

ঠা। তাহার চরিত্র মন্দ হইয়াছে। সে বোধ হয় গোয়ালাপাড়া বেড়াইতে গিয়াছে!

মহা। আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। তাহার মুখের চেহারায় কিছুতেই তাহাকে মন্দস্বভাবের বলিয়া বোধ হয় না। সে আমাদের দূরে থাক, আমার তারার প্রতিও কখন মুখ তুলিয়া চায় না।

ঠা। প্রাতঃকালেই সব বুঝা যাইবে!

মহা। আচ্ছা বুঝ! মেয়ের বিবাহের কি করিতেছ? তাকে ত আর ঘরে রাখা ভাল দেখায় না।

ঠা। তা ত ঠিক, কিন্তু করি কি? আমার প্রাণাধিকা তারার যোগ্যপাত্র কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। একবার মেয়ের অদৃষ্টগণনা করাইতে বৃন্দাবনে যাইতে চাই।

মহা। যার গণনায় দিল্লীর বাদশা ভক্ত, সে কি নিজের মেয়ের অদৃষ্টগণনায় অশক্ত?

ঠা। আপন পারিবারিক গণনা করিতে গুরুর নিষেধ আছে।

মহা। তবে কবে বৃন্দাবন যাইবে?

বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভবনন্দন ভট্টাচার্য্য, ঠাকুর মহাশয়ের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার নিকটে যাওয়ার কথাই মহামায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঠা। এই সপ্তাহেই ভাল দিন দেখিয়া যাইব।

কথোপকথনে ব্রাহ্মণ-দম্পতি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে চাঁদ আসিয়া তাহার ঘরে শয়ন করিল। প্রাতঃকালে ঠাকুর মহাশয় চাঁদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গত রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে ?

চাঁদ। আমি বিষ্ণু-পুকুরের যমসের খাঁর বাড়ীতে গিয়াছিলাম।

ঠা। কেন ?

চাঁদ। আমি প্রায় প্রতি রাত্রিতে সেখানে লাঠি খেলিতে যাই।

যমসের খাঁ সম্ভ্রান্ত পাঠান। তিনি লাঠি-খেলায় দেশবিখ্যাত সর্দ্দার। তৎকালে লাঠিখেলা লিখন-পঠন বিদ্যা অপেক্ষা কম গৌরবের বিষয় ছিল না। দেশের প্রায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান লাঠি-খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর মহরমের সময় প্রসিদ্ধ খেলওয়ারদিগকে দেশের বড় লোকেরা যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিতেন। লাঠিখেলা, তরবারি ভাঁজ দেওয়ায় যিনি যত শৌর্য্য বীর্য্য দক্ষতা ও অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে ততোধিক মূল্যবান্ পুরস্কার প্রদত্ত হইত। বহু মূল্যের শাল বনাত, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনপত্র পর্য্যন্ত উপযুক্ত খেলোয়ারেরা পুরস্কার লাভ করিতেন। হায়! তে হি নো দিবসা গতাঃ।

মহৎ-হৃদয় ঠাকুর মহাশয়, ভৃত্যের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন। প্রকাশ্যে চাঁদকে কহিলেন, "খেলিতে যাইবার সময় বলিয়া গেলেই হইত।" চাঁদ সে কথার কোন উত্তর

করিল না। সে ভাবিয়াছিল খেলার কথা বলিয়া গেলে ঠাকুর মহাশয় যাইতে নিষেধ করিবেন।

দিনান্তরে তারা চাঁদকে কহিল, "ভাই, পদ্মামাসীর মুখে শুনিলাম, তুমি নাকি প্রতি রাত্রে লাঠি-খেলা শিখিতে যাও; আমাকে একদিন তোমার খেলা দেখাইবে?"

চাঁদ। লাঠি-খেলা দেখিয়া কি করিবে?

তারা তখন কৈশোরের আবদার যৌবনে জাগাইয়া কহিল, "আমাকে দেখাইতেই হইবে।"

চাঁদ। আচ্ছা, একদিন দেখাইব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিল্লী।

গঙ্গারাম ঠাকুর গুরুদর্শনে বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন। পাঠক আসুন,—আমরা এই অবসরে একবার দিল্লী হইতে বেড়াইয়া আসি।

ঐ দেখুন, সম্মুখে সেই মহামহিম বৈভবশালী, শোভার আধার, ঐশ্বর্য্যের খনি কনক-নগরী দিল্লী! ঐ দেখুন তাহার অভ্রভেদী চূড়া কুতবমিনার, ঐ দেখুন তাহার জামে মস্‌জিদের গগনস্পর্শী গুম্বজ্। যেন আকাশ-উচ্চতা উপহাস করিয়া উহারা দিল্লীশ্বরের স্পর্দ্ধা ঘোষণা করিতেছে। সংসার-রঙ্গভূমে দিল্লীর ন্যায় সুবিশাল মনোরম নাট্যশালা জগতে আর নাই। এক সময় ইহার বিস্তীর্ণ চত্বরে পঞ্চপাণ্ডব ও শত কৌরব দায়াদ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপূর্ব্ব অভিনয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বহুকাল পর এই নাট্যশালায় অনঙ্গপাল, জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ, সংযুক্তা প্রভৃতি আর্য্য নর-নারী বিপুলায়োজনে আত্মদ্রোহের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরকুলবরেণ্য মহারথ মহম্মদঘোরী তাঁহাদের আত্মগর্ব্ব সমূলে সংহার করিয়া

নাট্যশালা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। তদনন্তর মহামতি লাকবক্‌স কুতব, রাজন্যকুলশ্রেষ্ঠ আলতামাস ও তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালিনী কন্যা সোলতানা রেজিয়া, রাজর্ষি নাসির প্রভৃতি বাদশাগণ ন্যায়পরতামূলে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতি সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই নাট্যশালার মোহন-রঙ্গমঞ্চে সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলক অভিনেতারূপে দণ্ডায়মান।

পাঠক, ঐ দেখুন তাঁহার রাজধানীর প্রাচীর। ইহার পরিধি চত্বারিংশৎ মাইল এবং উচ্চতা ও প্রশস্ততা একাদশ হস্ত। প্রাচীরোপরি সংস্থিত বিচিত্র কারুকার্য্যসম্পন্ন সারি সারি উন্নত বুরুজ। চন্দ্রকিরণে যখন প্রাচীর-শীর্ষ উদ্ভাসিত হয় তখন দেখিলে মনে হয়, ঐরাবতারূঢ় অমল-ধবল-অম্বর-ভূষিত শত সহস্র সহস্রাক্ষ রাজধানী পরিরক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ফলতঃ এমন সুদীর্ঘ সুবিস্তীর্ণ প্রাচীর-পরিশোভিত রাজধানী জগতের আর কোথাও নাই।

পাঠক, সম্রাটের আড়ম্বরের কথা বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি? তিনি বিংশসহস্র রাজপুরুষ, দ্বিশত শাস্ত্রবিশারদ আলেম লইয়া প্রত্যহ আহার করিয়া থাকেন। এবং তাঁহার ভোজ্য-সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বলীবর্দ্দ, দ্বিসহস্র মেষ, অগণিত পক্ষী নিহত হয়। তাঁহার পারিবারিক ব্যবহারের জন্য চারি সহস্র তন্তুবায় পট্টবস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। পাঁচ শত কারিকর নিয়ত সাচ্চা জরীর পোষাক প্রস্তুতে নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি

বৎসরে দুই লক্ষাধিক পোষাক বিতরণ করিয়া থাকেন। কেবল মৃগয়ার সাহায্যের নিমিত্ত এগার শত লোক তাঁহার রাজপ্রাসাদে প্রতিপালিত হয় এবং মৃগয়ার সময় দুইশত হস্তী, দশসহস্র অশ্বারোহী, অসংখ্য পট্টবাস, অগণিত চন্দ্রাতপ তাঁহার সঙ্গে যায়। তাঁহার সর্ব্বনিম্ন কেরাণীর বার্ষিক বেতন দশসহস্র মুদ্রা; সর্ব্বাধম ক্রীতদাসের বার্ষিক বেতন সাড়ে তিন শত মুদ্রা।

পাঠক, এ হেন বাদশার রাজধানীর অভ্যন্তরীণ বৈভব-সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না কি? ঐ দেখুন, সম্মুখে সোনার প্রাচীরে ঘেরা তাঁহার জাহানপান্না নামধেয় রাজপ্রাসাদ। বিচিত্র লতাপাতা ফুল ফলে অঙ্কিত তাহার অক্ষয় শ্বেত প্রস্তরের সিংহদ্বার। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দ্বারের দৌবারিকদল শান্তশিষ্ট এবং অনাড়ম্বরে অবস্থিত। এই দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে রাজপুরীর প্রথম প্রাঙ্গণ উপবন-শোভিত এবাদতখানায় উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে আসিলে মনে হয়,—উৎকট আধিপত্য-কোলাহলপূর্ণ জ্বালাময় ভীতিব্যঞ্জক রাজ্য হইতে স্বর্গধামে উপস্থিত হইলাম। বাস্তবিক এবাদতখানার মত শান্তিময় পবিত্র স্থান দিল্লীতে আর নাই। এই স্থানের তিনটি পদার্থ দর্শনীয়;—উদ্যান, মস্‌জিদ ও কুতবমিনার। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই সেই উদ্যান;—এ উদ্যানের শোভা বর্ণনাতীত। সৌন্দর্য্যের অনন্তত্ব এক্ষেত্রে ভাবুককবিকে ভাবময় নীরবতার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতে থাকে।

উদ্যান প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীরের ঘনসন্নিবিষ্ট স্তম্ভগুলির

অগ্রভাগগুলি নিম্নতল সামিবৃত্তসমূহ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সামিবৃত্তগুলি সপ্তবর্ণের রামধনুর ন্যায় শোভমান। উদ্যানের ভূমিতল, ত্রিভুজ চতুর্ভুজ ষড়্‌ভুজ বৃত্ত বৃত্তাভাস প্রভৃতি আকারে বিভক্ত। সৌন্দর্য্যপ্রিয় সম্রাট্ জগতের সর্ব্বসেরা কুসুমাবলী চয়ন করিয়া এই সকল ভূমিতলে বপন করিয়াছেন। পুষ্পসমন্বিত এক এক খণ্ড ভূমিই এক এক রাজামহারাজের উপবন সদৃশ। সপ্তশত মালী এই মহোদ্যানের রক্ষক। উদ্যান-ভ্রমণের পথগুলি সুগম, প্রশস্ত এবং পাদচারণ-সুখকর। পথের উভয় পার্শ্বে অনতিদূরে—দূরে প্রস্ফুটিত সুগন্ধ বৃক্ষতলে সমুচ্চ বেদী সংস্থাপিত। বেদীগুলির কোনটি শ্বেত, কোনটি নীল, কোনটি লাল, কোনটি পীত, কোনটি সবুজ, কোনটি বা জরদা বর্ণের স্ফটিক মর্ম্মরে গঠিত।

উদ্যানের কোন স্থানে বর্ত্তুলাকার মঞ্জুলকুঞ্জের শ্যামল শিরে হেমাভবর্ণ ফুল ফুটিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তাহার ঘনসন্নিবিষ্টপত্রান্তরাল হইতে আত্মরূপচোরা স্বরসুধা প্রচারে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিয়াছে। কোন স্থানে রক্ত-চন্দন ও শ্বেত-চন্দন বৃক্ষ পরস্পর পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পরস্পর পুষ্প-বাস-বিতরণ-স্পর্দ্ধাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমস্ত উদ্যানভূমি আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে; এবং পতিময়াত্ম পত্নী যেমন পতিসন্নিধানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সৎকার্য্যের উৎসাহ-বর্দ্ধন-বিধায়িনী হয়, তদ্রূপ লবঙ্গলতা রক্ত-চন্দনের ও এলালতা শ্বেত-চন্দনের দেহ বেষ্টন করিয়া তাহাদের বাস-বিতরণকার্য্যের সহায়তা করিতেছে।

কোন স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পিণ্ডীর দ্রুমের সমুন্নত একদেশাঙ্গে সমন্তাৎ হরিদ্রাভ সবুজ সুকোমল পত্রমধ্যে নব কলিকারাজি নয়নোন্মীলন করিয়া রহিয়াছে এবং অধোভাগে সুপক্ক পিণ্ডীরগুলি অবলম্বনশাখা অবনমিত করিয়া ভূমিতলস্পর্শে উদ্যত হইয়াছে, আর তাহাদের রসাল দানা সকল যেন বাদশাহী বাগানের শোভা সন্দর্শনবাসনার আবেগ-উচ্ছ্বাসে মাতৃগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া মুখ বাহির করিয়া আছে, কিন্তু দ্বিজ বাচাল শুক আবার চঞ্চুপুটাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাদিগের মাতৃদ্রোহিতার প্রতিশোধ লইতেছে। স্থানান্তরে বদরীবৃক্ষ জ্যোতিষ্মতী লতায় পাগড়ী বাঁধিয়া বাদশাহী দরবারের প্রবৃদ্ধ আমিরগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার নিম্নদেশে আবার নগদেশানীত অন্তঃসত্ত্বা অজা সকল গর্ভদোহদালস্যে শয়ন করিয়া পুরতঃ পতিত সুরসাল বদরী ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিতেছে। কোনস্থানে দেবদারুমূলে নবোদ্গত বহুশাখ সূক্ষ্মাগ্র-শৃঙ্গ মৃগকিশোরকুল পরস্পর আপনাঙ্গ সংলগ্ন করিয়া শয়ন-মন্থরে সুখানুভব করিতেছে, কিন্তু শিরসি সমাসীন ঘুঘু তাহার স্বভাবগম্ভীর আরাবে তাহাদের সুখালস্যে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। কোন স্থানে কদম্ব-তরুতলে শিখি-দম্পতি সান্ধ্য তিমিরে মেঘোদয় ভাবিয়া ইন্দ্রধনু-মনোহর কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছে, আবার তৎসৌন্দর্য্য দর্শনে লজ্জিত হইয়া কদম্ব স্বকীয় পুষ্প-সুষমা পত্রাবরণে আচ্ছাদিত করিতেছে।

পাঠক, সম্মুখে অগ্রসর হউন। ঐ দেখুন,—বাদশাহী বাগানে ফুলের হাট। এই মহোদ্যানরাজ্যে এই হাটের শোভা

সর্ব্বাধিক মনোমোহকর। বিচিত্র বর্ণের পাতাবাহার-প্রাচীরে ইহা পরিবেষ্টিত। মনে হয়, স্বয়ং প্রকৃতিরাণী নীলাভরক্ত গরদের চেলী পরিধান করিয়া এই ফুলের হাটের শান্তি সংরক্ষণে নিয়োজিত রহিয়াছেন। জবা, যূঁই, বেলী, চামেলী, গেঁদা, অতসী, কুন্দ, লোধ্র, শিরিষ, কুরুবক, হেনা, কেতকী, পদ্ম ও গোলাপ প্রমুখ কুসুম-কামিনীগণ স্ব স্ব সাময়িক পরিমল ও সৌন্দর্য্যের পসরা খুলিয়া হাসি হাসি মুখে বসিয়া আছে। কৃষ্ণ-নীল-স্বর্ণাভ বর্ণে মধুমাক্ষিক ক্রেতাগণ উড়িয়া ঘুরিয়া গুণ্ গুণ্ বচনে তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত শিলীমুখ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধভাবে নব-যৌবনা কুসুম-বালাদিগের বক্ষে সংলগ্ন হইয়া পরিমল-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। সলাজ সরলা বালিকাগণ তাহাদের স্পর্শভার-পীড়নে কম্পিত ও অবনমিত হইতেছে। আবার অপর ভ্রমরগণ তদ্দৃষ্টে হিংসা বা ক্রোধভরে দুর্ব্বৃত্তগণের পৃষ্ঠে হুলদণ্ডে আঘাত করিতেছে; কিন্তু তথাপি তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না! অন্য কতিপয় চৌর ভ্রমর প্রসূন-প্রৌঢ়াদিগের পরিমলাহরণ মানসে তাহাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু রজে অন্ধীভূত হইয়া দিগ্ভ্রান্ত উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া পলাইতেছে। ন্যায়পর তেজস্বী ভ্রমরেরা তদ্দর্শনে ধর ধর—গুণ্ গুণ্ গর্জ্জনে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ভূমিতলে চিৎপাত করিয়া ফেলিতেছে। প্রৌঢ়াদিগের প্রতিবাসিনী ফুলকুমারীরা চৌরগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। প্রজাপতিগণ অমরবালার কনকাঞ্চলের ন্যায় সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া

এই ফুলের হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু ষট্পদ পাষণ্ডগণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ঘৃণাভবে অন্যত্র উড়িয়া যাইতেছে।

এই ফুলের হাটে তাব্রিজের বেলী, সিরাজের স্থলপদ্ম ও বসরার গোলাপ সুষমা-গৌরবে অন্য সকল পুষ্পরাণীর বরণীয়া। ধর্ম্মপরায়ণ বাদশা প্রতিদিন মস্জিদে ফজরের নামাজ পড়িয়া যখন প্রাতর্বায়ু-সেবনোপলক্ষে এই ফুলের হাটে উপস্থিত হন, তখন এই সকল ফুলরাণী, বেগমগণের সম্মানার্থ স্ব স্ব পসরা হইতে বাদশাহকে ফুল দান করিয়া থাকে।

শুক্লাষ্টমী ও পৌর্ণমাসী যামিনীযোগে যখন সমস্ত উদ্যানভূমি রজতধারায় প্লাবিত হয়, তখন বেগমগণ সহচরীপরিবৃতা হইয়া এই উদ্যানবিহারে উপস্থিত হন, তখন কোন্গুলি পদ্ম গোলাপ, কোন্গুলি বেগম, কোন্গুলি বেলা চামেলী, কোন্গুলি সহচরী বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য হয়। পাঠক, এই উদ্যানের ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করুন;—দেখুন, কি অপূর্ব্ব মনোরম পানির লহর! কি সুন্দর সুন্দর চৌবাচ্চা! কি প্রশান্ত নীলতোয় সরোবর! কিবা বিচিত্র-দৃশ্য উৎস! ভুবনবিখ্যাত জোবেদা লহরের অনুকরণে বাদশাহ এই পানির লহর খনন করিয়া গোদাবরী-মর্ম্মরে ইহার তলদেশ গ্রথিত করিয়া তুলিয়াছেন। যমভগ্নী যমুনা অনবরত এই লহরে পানি যোগাইতেছে। মর্ম্মর-তল-চল-চঞ্চল পানির লহরে সূর্য্যের কনক কিরণ প্রতিফলিত হইলে মনে হয়, যেন ভূতলেও চল সৌদামিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। লহরের উভয় তীরে অনতি দূরে দূরে কামিনীবৃক্ষসমূহ অমলধবল ফুলের মুকুট

মাথায় দিয়া পানি রক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। শ্বেতমর্ম্মরগ্রথিত চৌবাচ্চাসমূহের কোনটিতে স্বর্ণজলে রৌপ্য-মীন, কোনটিতে রৌপ্যজলে স্বর্ণ-মীন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সরোবরসমূহের কোনটিতে রক্তোৎপল, কোনটিতে শ্বেতোৎপল বিকশিত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নবীন অভিনয় প্রদর্শন করিতেছে। উৎসগুলির কোনটি হইতে গোলাপের, কোনটি হইতে হেনার, কোনটি হইতে বেলীর তরলসার উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত হইয়া সুধীর সঞ্চরমান বায়ুপ্রবাহ সুস্নিগ্ধ ও সুগন্ধীকৃত করিয়া দিতেছে।

এই মহোদ্যানের স্থানে স্থানে সুধালেপিত সমুচ্চ অট্টালিকা, তাহার অলিন্দে ও অভ্যন্তরে বিশ্রামসহায় চারুবর্ণের সুকোমল উপবেশনাসন এবং যথাযথ স্থানে পুষ্প-কুঞ্জে মর্ম্মরবেদী বিরাজিত।

এই ভুবন-সুন্দর উদ্যানের এতাদৃশী শোভা-সম্পদেও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সৌন্দর্য্য-প্রিয় সম্রাট্ বাগানের স্থানে স্থানে কৃত্রিম মাণিক-বৃক্ষ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বৃক্ষের মূলদেশ প্রবালখচিত, কাণ্ড পদ্মরাগে গঠিত, শাখা ইয়াকুতে, পাতা মরকতে, ফল হীরার দানায়, ফুল মৃগনাভি কস্তুরীতে নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছেন। জগতের কৃত্রিম আশ্চর্য্যের মধ্যে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মানুরক্ত সম্রাট্ প্রত্যহ অপরাহ্নে দ্বিশত শাস্ত্রদর্শী আলেম সহ এই উদ্যান-প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করেন।

পাঠক, এইবার দিল্লীর মস্‌জিদ ও কুতবমিনারের নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করুন। উপাসনার নিমিত্ত এমন দুইটি শিল্পকলার চরম নিদর্শন কীর্ত্তিস্তম্ভ জগতে আর নাই। ইস্‌লামের গৌরব-রবি যেন এই কীর্ত্তিস্তম্ভদ্বয়শিরে চিরাচল ও চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের গঠন-চমৎকারিত্বে দর্শনেন্দ্রিয় স্পন্দনশূন্যহয়, বিশালতায় ও উচ্চতাগরিমায় মন প্রাণ ভীতি-বিহ্বল-পুলকে অবশ হইয়া পড়ে, নিরুপম ভাস্কর-যশঃ-সৌরভ সমীরণসঞ্চালনে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল হর্ষতরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে! মোস্‌লেম শিল্পী কোথা হইতে কেমন করিয়া এমন চিন্তাতীত, এমন স্বপ্নাতীত সুরুচিসঙ্গত কল্পনা-শক্তি লাভ করিয়া, কোন্ নিপুণহস্তে কিরূপে তুলিকা ধারণ করিয়া এমন অট্টালিকা-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ভাবিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

মস্‌জিদের ভূমিতল হুতভঞ্জিত স্বর্ণ-পাটখেলে গ্রথিত। মেজে নানা বর্ণের মর্ম্মরে আস্তৃত। প্রস্তরসমূহের সংযোগ রেখা এমন্ ভাবে সংশ্লিষ্ট যেন মনে হয় বিভিন্ন বর্ণের একখানি বৃহৎ প্রস্তরে সমস্ত মেজে আবৃত। সমুন্নত সুবিশাল ভিত্তিচতুষ্টয় এক-রঙ্গী স্ফটিক মর্ম্মরে, ঊর্দ্ধতল সুবর্ণ টালিতে গ্রথিত এবং খিলানশূন্য গুম্বজ-অভ্যন্তর চন্দ্রকান্তি প্রস্তরচূর্ণে প্রলেপিত। সংযোগশূন্য জানালা-কবাট আবলুশ ও চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত। সুবর্ণখচিত অগণিত ঝাড় লণ্ঠন সুবর্ণ-সূত্রে প্রলম্বিত। যখন সবকদর ও সবেরাতের পুণ্যবিভাবরী যোগে এই বিশালায়তন ভুবন-মনোহর মস্‌জিদ আলোকমালায় ও ফুলের তোড়ায় শোভিত হয়,

তখন মনে হয় ইহা পৃথিবীর জিনিষ নয়, ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাটের উপাসনার জন্য দেবলোক হইতে দিল্লীতে নামিয়া আসিয়াছে। মস্‌জিদের দক্ষিণাংশস্থ কুতবমিনার নির্ম্মাণ-কৌশল ও শিল্পকলার চরম নিদর্শন। ইহার বহির্ভাগ খিলানশূন্য অক্ষয় প্রস্তরের গাঁথনিতে নিম্ন হইতে উর্দ্ধমুখে ক্রমসূক্ষ্ম চোঙ্গের সদৃশ করিয়া তোলা হইয়াছে। অভ্যন্তরভাগ সুদীর্ঘ একাদশ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের উপরিভাগে স্বচ্ছন্দবাস প্রকোষ্ঠ। এই সকল প্রকোষ্ঠে উঠিবার নিমিত্ত স্ক্রু-যন্ত্রের আকারের সোপানাবলী। ধর্ম্মশীল মহামতি কুতবউদ্দিন আজান দেওয়ার নিমিত্ত এই অপরূপ মিনার প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যখন আকাশ-উচ্চতা-উপহসিত এই মিনারচূড়ায় দাঁড়াইয়া মোয়াজ্জান (১) আজানের পবিত্র মোহন ধ্বনিতে দিগন্ত মাতাইয়া তোলেন, তখন নীরদবরণী ফেন-পুষ্পমালিনী যমুনা সে মোহন রবে মাতোয়ারা হইয়া কুল-কুল আরাবে তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিতে থাকে, যখন সাহান্‌শাহ সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক সেই চিত্তদ্রাবী রব শ্রবণ করিয়া বিংশতি সহস্র রাজকর্ম্মচারী ও দ্বিশতাধিক আলেম সহ বিশ্ব-বাদশার আরাধনা-মানসে মস্‌জিদে উপস্থিত হন, তখন বুঝা যায় একসঙ্গে দয়াময়ের গুণগান করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশীল মানবকে আহ্বান করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা আজান ব্যতীত আর কিছুই নাই। যখন সাহানশা বাদশা

---

(১) যিনি আজান দেন—অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহো আকবর" রবে নামাজের জন্য সকলকে আহ্বান করেন।

রাজত্ব ভুলিয়া—রাজপদ ভুলিয়া—বাদশাহী সম্মান ভুলিয়া, অধীন কর্ম্মচারী প্রজাসাধারণ ও ক্রীতদাসগণের সহিত এক পংক্তিতে একই ভাবে একই মনে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া বেতনভোগী অধীন এমামের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক তাহার পশ্চাদনুসরণে বাধ্য হন, তখন প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে নামাজই মানব-জগতে সাম্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শ পন্থা। সাম্য শিক্ষাদানে নামাজের ন্যায় শিক্ষক আর নাই।

যখন বাদশা আদি ছোট বড় সকল মোক্তাদি সর্ব্বতোভাবে এমামের অনুকরণে একই সময়ে একই প্রণালীতে "আল্লাহো আকবর" রবে পুনঃ পুনঃ মস্তক নতোত্তোলিত ও মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে থাকেন, তখন উপলব্ধি হয়, মানবজাতিকে একতা শিক্ষাদানে নামাজের দ্বিতীয় আর নাই। যখন এমামের ভাবভরা প্রাণপোরা মোনাজাতের সহিত মোক্তাদি, ভক্তিবিহ্বলচিত্তে আমিন আমিন বলিতে থাকেন, এবং যখন সেই মধুমাখা প্রার্থনা-বাণীর প্রতিধ্বনিরূপে পাষাণ-দেহ মস্‌জিদের বুক ফাটিয়া আমিন আমিন রব উত্থিত হইতে থাকে, তখন মনে হয়—ইস্‌লাম তুমিই সত্য, তুমিই ধন্য, তুমিই সুন্দর!

কুতবমিনার শিরে দাঁড়াইলে দিল্লীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অক্ষি-গোলকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে যবশীর্ষ-সুশোভিত উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তরে তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পাদদেশে রজতশুভ্র বীচিবিভঙ্গ নীলনীরা যমুনা বহিয়া যাইতেছে।

যখন সুধাংশুর অমিয়কিরণে মহানগরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন মনে হয় স্থিরযৌবনা ষোড়শী দুর্গা কৃষ্ণকুন্তল এলাইয়া কটিতটে ডায়মন-কাটা মরকত-মেখলা ধারণ করত অভিমানে আত্মহারা হইয়া উন্মুক্তবক্ষে দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রান্তরস্থিত প্রাচীন খর্জ্জুরবৃক্ষ ধূর্জ্জটীর ন্যায় তাঁহার মানভঙ্গের চেষ্টা করিতেছে।

এই মহোদ্যান-শোভিত শান্তিময় এবাদতখানার পশ্চিমাংশে আবার তোরণ-দ্বার। এ দ্বারের শোভা আরও বিচিত্র। তুষার-শুভ্র স্নেহপিচ্ছিল দ্বিরদ-দন্তে সামিবৃত্তাকারে এই প্রবেশদ্বার ও উভয় পার্শ্বের স্তম্ভ নির্ম্মিত। দ্বিরদ-রদোপরি চিত্তচমৎকারিণী কুসুমলতিকার সৃষ্টি, জগতে অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। দ্বারে দৌবারিকদল, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তাহাদের হাবভাব। তাহাদের কটিতটে শাণিত কৃপাণ; মস্তকে বিচিত্র উষ্ণীষ; তাহাদের পাদবিক্ষেপগর্ব্বে ধরিত্রী বিকম্পিতা। তোরণদ্বারের সামিবৃত্তাংশ আবার সপ্তবর্ণের মণিখচিত। বোধ হয় যেন ভূতলে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাব। এই দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বিপুল বিস্তীর্ণ দেওয়ানখানা। ইহা দ্বিতল সৌধাবলীতে শোভিত এবং রাজকর্ম্মচারীতে পরিপূর্ণ। দেওয়ানখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ কাষ্ঠাসনে যোড়া। তদুপরি তুরস্কের বিচিত্র মছলন্দ আস্তীর্ণ। তাহার উপর বিচিত্র পরিচ্ছদধারী অগণিত রাজকর্ম্মচারী সমাসীন। কাহার শিরে তুষার-উষ্ণীষ, কাহার শিরে ইরাণী টুপী। উজীর ব্যতীত দেওয়ানখানার প্রধান কর্ম্মচারী হিন্দু। তদ্ব্যতীত আরও অনেক হিন্দু কর্ম্মচারী বাদশাহের অনুগ্রহে দেওয়ানখানার

চাকরী করিতেছেন। তাঁহাদেরও মাথায় কিস্তিটুপী, পরিধানে আচকান পাজামা। এই দেওয়ানখানার একাংশে আম দরবার-গৃহ। এই গৃহে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। বাদশাহ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণকালে সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আম দরবার-গৃহের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য লোকাতীত। ইহার স্ফটিকবিমণ্ডিত স্তম্ভাবলী সুবর্ণখচিত রেশমী চাদরে আবৃত, ভিত্তিগাত্র চুণী পান্না বিজড়িত; সিংহাসন-উপরে মহামূল্য অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ।

দেওয়ানখানা আকুমারিকা হিমগিরির ইঞ্জিনস্বরূপ। এই স্থানের বিধি-বিধানানুসারে ভারত সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়।

দেওয়ানখানার পশ্চিমাংশে বাদশাহের প্রিয় [illegible] কোতুবখানা। কোতবখানার পর অন্দরমহল; কিন্তু পাঠক, এ মহলের দৃশ্য আপনাকে কেমন করিয়া দেখাইব? যাঁহারা ভারতে পর্দ্দা-প্রথার প্রচারক, যাঁহারা স্বকীয় পুরমহিলাগণের কণ্ঠস্বরও দৈবাৎ পরপুরুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া দোষাবহ মনে করেন, এমন কি প্রকৃতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণ যে স্থানে সাবধানে গমনাগমন করে, আমরা কেমন করিয়া অলীক কল্পনাপ্রিয় ধৃষ্ট লেখকগণের ন্যায় সেই পূতপুণ্য সতী সাধ্বী বেগমগণের শয়ন-মন্দিরের শোভা আপনাকে দেখাইব? অতএব আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সন্তর্পণে রাজদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুরাকাঙ্ক্ষা।

ঐ দেখুন বাদশা তাঁহার প্রিয়তম কোতবখানায় কেতাবসমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আবার উজির মালেকজাদ বাদশাহের সাক্ষাৎ প্রার্থনায় কুর্ণিস করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যজগতের রাজমন্ত্রী দৈনন্দিন রাজকার্য্য শেষ করিয়া গৃহপ্রত্যাগমনের পূর্ব্বে একবার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। ছয়শত বৎসর পূর্ব্বেও দিল্লীর রাজমন্ত্রীর এইরূপ বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের নিয়ম ছিল।

বাদশা কেতাব হইতে মুখ তুলিয়া "আসুন আসুন উজিরবর, রাজ্যের কুশলবার্ত্তা বলুন" বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য আসনে উপবেশনের আদেশ প্রদান করিলেন। উজিরবর নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা, খোদাওয়ান্দ, রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিবিরাজিত।"

বাদশা স্মিতমুখে মৃদুমধুরে কহিলেন, "উজিরবর, আপনারা এই সকল উৎকট সম্ভাষণ কোথায় পাইয়াছেন? আমি ঐরূপ সম্বোধন আদবেই পছন্দ করি না এবং আমি ইহার যোগ্যও

নহি। আপনি আমাকে সরল কথায় কেবল আপনি সম্বোধন করিবেন। তুমি বলিলেও আপত্তি নাই। কারণ আপনি জ্ঞানে প্রবীণ, বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ আমার পিতার আমলের উজির।”

উজির মালেকজাদ বাদশাহের অনুপম শিষ্টাচারের বিষয় পূর্ব্বাবধি অবগত আছেন, তথাপি নিজ ভদ্রতা রক্ষায় পুনরায় বাদশাকে দুনিয়ার মালিক বলিতেই তিনি আবার হাসিয়া কহিলেন, “উজিরবর, আপনার এ সম্বোধন আরও উৎকট। সমস্ত দুনিয়ার তুলনায় হিন্দুস্থান ক্ষুদ্রতম রাজ্য। আমি সেই সামান্য জনপদের প্রজাপালকমাত্র। আমি যদি বাদশা সেকেন্দার, সুলতান মামুদ গজনবীর বা বীরকুলতিলক মোহাম্মদ গোরীর ন্যায় দিগ্বিজয়ী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার এই সম্ভাষণ কতকটা সঙ্গত ও সম্ভবপর হইত।”

উজির। বাদশা নামদার, আপনি উল্লিখিত সাহান শাহ বাদশাগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আপনার স্বর্গীয় কেবলাজান (১) বাদশা দিগ্বিজয়ে মনন করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় কাল অকালে তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করায়, তাঁহার মনের সাধ মনেই রহিয়া গিয়াছে। আপনি তাঁহার কুলতিলক যোগ্যপুত্র, অনন্ত গুণের আধার, অসীম পরাক্রমশালী এবং বিদ্যার সাগর। বিদেশ জয় করিয়া পিতার পারলৌকিক আত্মার সাধ পূর্ণ করা আপনার পক্ষে কঠিন কি?

---

(১) পিতৃদেব।

দিগ্বিজয়ের কথায় অধ্যয়ননিরত বাদশার শান্তিপূর্ণ বদনমণ্ডল আকাঙ্ক্ষাবশে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। এ জগতে "আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই" একথা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে নিত্য সত্য। আবার এই নিত্য সত্যবাণী বৈষয়িক ব্যাপারে সর্ব্বাধিক প্রযোজ্য।

যে কড়ার কাঙ্গাল, সে তাম্রমুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করে, ভাগ্যক্রমে তাহা পাইলে সে রৌপ্য-মুদ্রালাভে ব্যস্ত হয়; রজত-মুদ্রার প্রাপ্তি ঘটিলে, সে স্বর্ণমুদ্রালাভের প্রয়াসী হয়; সে প্রয়াস সফল হইলে সে ক্রমে কুবেরের ধনাগার আত্মসাৎ করিতে বাসনা করে। কিন্তু এ সকল লাভ করিয়াও তাহার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। এইরূপে যে একবিঘা জমির মালিক সে দশ বিঘা চায়, দশ বিঘা পাইলে শত বিঘা, ক্রমে সহস্র বিঘা, তাহার পর জমিদার হইতে চেষ্টা করে, তাহাতেও তাহার আশা পূর্ণ হয় না, রাজা হইতে পারিলে সে সুখী হয়; কিন্তু হায় আকাঙ্ক্ষা! শেষে রাজা হইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। সম্রাট্ হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে, ভাগ্যফলে সম্রাট্ হইলে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত তাহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠে। কিন্তু এত করিয়াও তাহার বৈষয়িক আশার শান্তি হয় না। শুনিতে পাই, বিশাল এসিয়া মহাদেশ জয় করিয়াও আলেকজাণ্ডারের বিজয়সাধ অপূর্ণ রহিয়াছিল। তাঁহার জয়ের জন্য আর পৃথিবী নাই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর যাবতীয় খৃষ্টানশক্তি পদদলিত করিয়া যখন মহাবীর ওকৃবার দ্রুতগামী দিগ্বিজয়ী অশ্ব আটলাণ্টিক মহাসাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া নিমজ্জিত হইতেছিল, তখন বীর-

বর ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—হে বিশ্বপতে, আমার পুরোভাগে জয়ের জন্য যদি তুমি কোন ভূভাগ রাখিয়া দিতে, তাহা হইলে সেখানেও আজ তোমার একত্বের প্রচার করিয়া যাইতাম। কিন্তু হায়! এযে মহাসমুদ্র। কর্সিকাদ্বীপের এক নগণ্য ক্ষুদ্র বালক কালে সমস্ত ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হইলেন। তথাপি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না; ইংলণ্ড বিজয়ে বলবতী বাসনা জন্মিল। তিনি আগোণে ইংলণ্ডে অভিযান করিলেন, কিন্তু আল্প পর্ব্বত তাঁহার গমনে বাধা জন্মাইল। তখন আকাঙ্ক্ষা, অভিযানকারীর কানে কানে কহিল, বীরের গমনপথে পর্ব্বত থাকিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত কাটিয়া পথ প্রস্তুত হইল। তাহার পর যাহা হইয়াছিল ইতিহাসজ্ঞ পাঠক তাহা জানেন।

সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলক মন্ত্রীর প্ররোচনায় দিগ্বিজয়ের মানস করিলেন। দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিনাশের পথে লইয়া চলিল। মানুষ হাজার জ্ঞানী বা বিদ্বান্ হইলেও অপূর্ণ। বাদশা উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধ্য প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন হইয়াছে কি?"

উজির। বিদ্রোহ সম্যক্ নিবারিত হইয়াছে।

বাদশা। প্রদেশের বাকী খেরাজ আদায় হইয়াছে?

উজির। যাহা বাকী আছে দিগ্বিজয় উপলক্ষে তাহা সত্বর আদায় হইবে।

বাদশা। রাজকোষে কত টাকা মজুত আছে?

উজির। সাড়ে পাঁচ কোটি।

বাদশা। সৈন্যসংখ্যা কত হইবে ?

উজির। তিন লক্ষেরও বেশী।

বাদশা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"এত অল্পসংখ্যক অর্থ ও সৈন্যবলে বিদেশ-বিজয় কি সম্ভবপর ?"

উজির। মজুতের প্রায় চতুর্গুণ বাকী খেরাজ আদায় হইবে। আর প্রতিবাসী আফগানরাজ আমাদের বন্ধু। হুজুরের মহতী বাসনা অবগত করাইলে তিনি তাঁহার সৈন্যদ্বারা আমাদের সাহায্য করিবেন, তাঁহার দুর্দ্ধষ ও অমিততেজা সহস্র সৈন্য বিপক্ষের লক্ষ সৈন্য বধ করিবে।

বাদশা উজিরের কথায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইলে দিগ্বিজয় অভিযান স্থির হইল। এখন কোন্ দেশ আপাততঃ জয় করা যাইতে পারে ?"

উজির। আমাদের দেশের বায়ুকোণে ইরাণ, অগ্নিকোণে চীন। উভয় দেশই ধনধান্যে পরিপূর্ণ, পরন্তু উভয় দেশের বাদশাই বিধর্ম্মী ; এই দুই দেশ জয় করিতে পারিলে এবং পবিত্র কোরাণ-মাহাত্ম্যে উভয় দেশের অধীশ্বরকে দীন এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, সমস্ত দুনিয়ায় হুজুরের সুযশ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আপনি ধরাধামে হজরত সোলায়মান পয়গম্বরের ন্যায় সম্পূজিত হইবেন।

বাদশা উজিরের কথায় যারপর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন,

"আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে পৌরুষের কথা বটে। আপনি ত্বরায় অনাদায়ী খেরাজ আদায়ের উপায় করুন। সেপাসেলারকে (১) সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত ও সুশিক্ষিত করিবার অনুমতি দিউন।" বলিয়া বাদশা পুনরায় কেতাবে চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন। উজির বাদশাকে কুর্ণিস করিতে করিতে পশ্চাৎ হটিয়া কোতবখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

(১) সেনাপতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উজিরের দুরাশা।

রাত্রি প্রহরেক অতীত, উজির মালেকজাদ তাঁহার নির্জ্জন সৌধকক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন।—অমরবাঞ্ছিত দিল্লীর সিংহাসনে কি উপবেশন করিতে পারিব না? উজির বুল্‌বন যদি প্রবলপ্রতাপ নাসির উদ্দীনের নিকট হইতে দিল্লী সাম্রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন; জালাল উদ্দীন যদি কায়কোবাদকে নিহত করিয়া রাজতক্ত দখল করিয়া থাকেন; কাফুর ও খসরু যদি গোলামের গোলাম হইয়া সাহান শা বাদশা হইতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে আমি নিরাশ হইতেছি কেন? আমার আশা কেন পূর্ণ হইবে না? রাজ্যের সমস্ত ভার ত বাদশা আমার হাতে দিয়া, কেবল দিনরাত পুস্তক অধ্যয়নেই নিযুক্ত আছেন। সেপাসেলার, দেওয়ান কার্য্যাধ্যক্ষ ত আমার আদেশ ইঙ্গিত পালনে কৃতার্থ; প্রাদেশিক সুবাদার, দেশমুখ্য, ফৌজদার প্রভৃতিও আমার অনুগ্রহের ভিখারী। ইচ্ছা করিলে ইহাদের সাহায্যে সব করিতে পারি, তবে রাজতক্তলাভে নিরাশ হইতেছি কেন? একটু বাধা এই,—বাদশা আমাকে যেরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি করেন, তাহাতে তাঁহাকে জালাল খসরুর ন্যায় একদম বধ করা চলিবে না, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। আজ যে বিষয়ে যে ভাবে বাদশাকে অনু-

প্রাণিত করিয়াছি, খুব সম্ভব তাহাতেই আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে। পারস্য ও চীন বিজয়ে যে পরিমাণ অর্থ ও সৈন্যবলের প্রয়োজন, তাহার সিকি পরিমাণ বলও বাদশার ষ্টেটে নাই। আফগানরাজের সাহায্য প্রাপ্তি ত আকাশে পুষ্পোদ্যান রচনা মাত্র। কিন্তু বাদশা যে কার্য্যে মনন করেন, তাহা না করিয়া ছাড়েন না। দিগ্বিজয়গমনে যখন সৈন্য ও অর্থাভাব ঘটিবে, তখন দেশমুখ্য ও গরীবগণের প্রতি অনাদায়ী জুলুমের আদেশ হইবে। তাঁহারাও যুদ্ধের অছিলায় প্রজাগণের নিকট হইতে অসঙ্গতরূপে কর আদায়ের চেষ্টা করিবেন। প্রজাগণ দিতে অসমর্থ হইলে তাহাদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ হইবে, তখন নিরীহ প্রজাগণ অত্যাচার সহিতে না পারিয়া বন জঙ্গলের আশ্রয় লইবে। দুর্দ্ধর্ষ জনগণ ক্ষেপিয়া উঠিবে। এইরূপে যখন সর্ব্বত্র বিদ্রোহ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তখন সে আগুনে বাদশাকে নিশ্চয় পুড়িয়া মরিতে হইবে। তখন ‘যা শত্রু পরে পরে’ এইরূপ পরস্মৈপদ্ধতি অবলম্বনে দিল্লীর সিংহাসন আয়ত্ত করিয়া লইব। যখন নবাব ও দেশমুখ্যগণ আমাকে বাদশাহ বলিয়া কুর্ণিস করিবেন, তখন তাহাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তিনবৎসরের বাকী রাজস্ব এবং প্রজাগণের এক বৎসরের দেয় কর রেহাই দিয়া রাজসিংহাসন সুদৃঢ় করিয়া লইব।

উজির মালেকজাদ এইরূপ দুরাশা-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া রাজতক্ত লাভের চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

-:o:-

বৃন্দাবনে মিহির পূজা।

বৃন্দাবনের উপকণ্ঠে ভবনন্দন ভট্টাচার্য্যের বাসভবন। তিনি দেশবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান। গণনায় তিনি বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া আপামর সকলের নিকট বিশ্বস্ত। দূরদেশ হইতে অনেক-ছাত্র জ্যোতিষশিক্ষার্থ তাঁহার নিকটে আসিয়া থাকেন। তিনি ছাত্রগণকে সযত্নে বিদ্যাদান ও অন্নদান করিয়া প্রতিপালন করেন। দেশের গণ্যমান্য অনেক জ্যোতিষী এইরূপে তাঁহার ছাত্রমধ্যে গণ্য।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আজ মিহির-পূজার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিস্তর নিষ্করভূমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলেন। পাঠান বাদশাগণ রাজত্ব লাভ করিয়া হিন্দুদিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি কখন বাজেয়াপ্ত করেন নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পৈতৃক নিষ্কর ভূসম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিলেন। নিষ্কর জমিতে তিনি

যে লাভ পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় সচ্ছল ভাবে সম্পন্ন হইয়াও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকিত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা-বিদ্যাতেও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেন ; সুতরাং তিনি অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে গণ্য। আজ তাঁহার পূজার আয়োজন তাঁহার অবস্থানুযায়ী। পাকা ফলাহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। দীন-দুঃখী অন্ধ-আতুর আজ ফলাহার ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিবে ; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্তেবাসিবর্গের আজ পোয়াবার। পূজোপলক্ষে তাহাদের দুই দিন পাঠ বন্ধ। সকলেই আজ আমোদ-আহ্লাদে গান-বাজনায় প্রমত্ত আছে। এমন সময় একজন প্রৌঢ়ারব্ধ সুন্দর পুরুষ আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। আগন্তুকের শিখা-সমন্বিত শিরে কিস্তি টুপী, কণ্ঠে শুভ্র যজ্ঞোপবীত, চরণে দিল্লীর নিনামা। ভট্টাচার্য্য 'দীর্ঘায়ুরস্তু' বলিয়া আগন্তুককে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আগন্তুক গাত্রোত্থান করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন ; ভট্টাচার্য্যমহাশয় সহর্ষে কহিলেন,—"গঙ্গু যে ! ভাল আছ ? আমার সাধের পূজার সময় আসিয়াছ, বড়ই সুখের কথা ! তুমি আমার সর্ব্ব প্রথমের গৌরবান্বিত ছাত্র। এ সময় তোমাকে পাইয়া বাস্তবিকই আনন্দিত হইতেছি। তোমার বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ত ?"

ঠাকুর মহাশয় বিনীত ভাবে কহিলেন,—"প্রভুর আশীর্ব্বাদে দীনের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল।"

ভট্টা। শুনিয়া সুখী হইলাম। আমি দেবতার পূজা একদিনের স্থানে তিন দিন করিয়াছি। গঙ্গু, জীবনে কোনই

সৎকার্য্য করিতে পারিলাম না। এই তিন দিনের পূজোপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী দীন-দরিদ্র নর-নারীকে পেট পূরিয়া যে ফলাহার দিতে পারিব ইহাতেই আমার পরম সুখ। দূরে থাক বলিয়া তোমাকে নিমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাই না। এ সময় আসিয়াছ যখন, তখন পূজার কয়েকদিন থাকিয়া উৎসবের শৃঙ্খলা বিধান কর। এখন পূজার বেলা অতীত প্রায়, তুমি ছাত্রাবাসে যাইয়া কাপড় ছাড় বা অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর সহিত দেখা কর। তিনি অনেক সময় তোমার কথা বলিয়া থাকেন।” ইহা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। গঙ্গুঠাকুর গুরুমার পদধূলি লইতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

তিন দিন সমানভাবে মিহিরপূজার উৎসব হইল। সমানভাবে তিন দিন দীন-দরিদ্রগণকে পেট পূরিয়া পাকা ফলাহার ভোজন করান হইল। চতুর্থ দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বহির্ব্বাটীর নির্জ্জন বিশ্রামাগারে বসিয়া গঙ্গুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর মহাশয় বিনীতভাবে ভট্টাচার্য্যের সন্নিহিত হইলেন।

ভ। তুমি প্রায় ১০।১২ বৎসর এখানে আইস নাই, তাই মনে হইতেছে, কোন প্রয়োজনবশতঃ আসিয়াছ ?

ঠা। গুরুদর্শন ও প্রয়োজন দুইই আছে।

ভ। প্রয়োজন বিবৃত করিতে পার।

ঠা। কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

ভ। অর্থাভাব ?

ঠা। পাত্রাভাব অর্থাভাব দুইই।

ভ। কন্যার বয়স কত?

ঠা। ষোড়শ বৎসর অতীত প্রায়।

ভ। দেখিতে কেমন?

ঠা। নিজের কন্যার রূপের কথা নিজে কি বলিব, এমন স্বরূপা মেয়ে প্রায় দেখা যায় না।

ভ। তথাপি পাত্রাভাব?

ঠা। তাই গুরুতর চিন্তার কারণ হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমি এ সম্বন্ধে কি করিতে পারি?"

ঠা। মেয়ের অদৃষ্ট গণনা করুন।

ভ। তুমিও ত পার?

ঠা। নিজ পারিবারিক গণনা করিতে প্রভুই নিষেধ করিয়াছেন।

ভ। আচ্ছা, তবে কল্য পূর্ব্বাহ্নে আমিই গণনা করিয়া দেখিব।

পরদিন পূর্ব্বাহ্ন আসিল। ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শিষ্য-কন্যার অদৃষ্ট গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্য অন্তরালে থাকিয়া গুরুর গণনার প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রথমবার গণিতে গণিতে ভট্টাচার্য্যের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি ভাবিলেন—একি? নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-কন্যা অদৃষ্ট এমন হইতে পারে না! গণনায় ভুল হইয়াছে ম

করিয়া সবিশেষ মনোযোগসহকারে পুনরায় গণনা করিতে লাগিলেন,—এবার তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত ও মলিন হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্যের অবস্থা দৃষ্টে শিষ্য শঙ্কিত হইলেন, তাঁহার কপাল দিয়া ঘর্ম্ম ছুটিল, অমঙ্গলাশঙ্কায় হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য গণনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অদূরে বিগ্রহমিহিরের পদতলে যে জ্যোতিষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক ছিল, তাহা আনিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐ পুস্তকে অদৃষ্টগণনার বিশুদ্ধ ক্রম ব্যাখ্যাত ছিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃতীয়বার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার গণনার চরম ফল দেখিয়া তিনি আর কোন বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করিলেন না। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের গণনায় যাহা দেখিয়াছিলেন এবারও তাহাই দেখিলেন। ফলতঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার গণনা অভ্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু অপূর্ব্ব বিধিনির্ব্বন্ধ ভাবিয়া তিনি অনেকক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। পরে ধীরভাবে ঠাকুর মহাশয়কে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—"গণনা করিয়া দেখিলাম তোমার কন্যা রাজ্যেশ্বরী হইবে, এই নিমিত্ত বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছে।"

কন্যা রাজ্যেশ্বরী হইবে শুনিয়া প্রথমে ঠাকুর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কোন্ পিতা এমন সংবাদে উৎফুল্ল না হয়? কিন্তু যখন ভাবিলেন—রাজ্যেশ্বরের স্ত্রী রাজ্যেশ্বরী, তখন দারুণ মনঃক্ষোভে তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল; তিনি বিশুষ্কমুখে কহিলেন,—"প্রভো, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা রাজ্যেশ্বরী

হইবে কিরূপে ? রাজ্যেশ্বর ত মোহাম্মদ তোগলক ? আমি কি কন্যাদায়ে জাতিচ্যুত হইব ?” গুরুর গণনার প্রতি তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। গুরুদেব শিষ্যের কথায় ফাঁফরে পড়িলেন। শেষে প্রতিভা বলে শিষ্যকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত কহিলেন,—“তোমার কন্যা রাজ্যেশ্বরী হইবে, ইহা নিশ্চিত। তবে তুমি রাজ্যেশ্বরী যে অর্থে সন্দেহ করিতেছ, শুধু ঐ অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ হয় না। এতদ্দেশের সম্রাটের অধীন দেশমুখ্য ভূস্বামিগণও রাজ্যেশ্বর বলিয়া কথিত হইতেছেন। আমাদের মথুরার দেশমুখ্য মিশ্র মহাশয় মহারাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, মহারাণী বা রাজ্যেশ্বরী নামে অভিভাষিত হইতেছেন। দেশে এইরূপ রাজা রাজ্ঞী অনেক আছেন। তোমার কন্যা এইরূপ কোন ঘরের রাজলক্ষ্মী হইবে।” গুরুর বাক্যে ভক্ত শিষ্যের জাতি-পাতাশঙ্কা ও মনঃক্ষোভ অপনীত হইল।

অতঃপর ঠাকুর মহাশয় গৃহপ্রত্যাগমনমানসে গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তারার দণ্ডকারণ্য।

পাঠক, দীর্ঘ সময় আপনারা চাঁদ বা তারার কোন সংবাদ পান নাই ; এ নিমিত্ত বোধ হয় অধীর ও অসন্তুষ্টচিত্তে লেখকের প্রতি বিরক্ত হইয়া তিরস্কার ও অভিসম্পাতরূপ শিলাবৃষ্টি বর্ষণে ত্রুটি করেন নাই। তা করুন—পাঠকের তিরস্কারই অকৃতী লেখকের পুরস্কার এবং পাঠকের অভিসম্পাতই তাহার আশীর্ব্বাদ ; সুতরাং প্রশান্তচিত্তে আপনাদিগকে এই আখ্যায়িকার ছাতু-প্রত্যাখ্যান ঘটনা একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। যে যুবক ছাতু প্রত্যাখ্যান করিয়া মাঠের দিকে চলিয়া গেল এবং সেই প্রত্যাখ্যান-আঘাতে যে বালিকার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কে ? বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। চাঁদ অদৃশ্য হইলে তারা চোখের জল মুছিয়া, ভগ্নহৃদয়ে খাবার লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মা তখন সবেমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছেন ; তিনি সোহাগী কন্যাকে বিমর্ষ দেখিয়া শশব্যস্তে কহিলেন,—“মা, তোর মুখভাব এমন কেন ? কি হইয়াছে ? এ সব কোথা হইতে আনিতেছিস্ ?” মেয়ে দুঃখের স্বরে কহিল,—“ভাই, প্রত্যহই না খাইয়া মাঠে যায়, তাই তাহাকে এ সকল খাবার দিতে গিয়াছিলাম।”

মা। ফিরাইয়া আনিলি কেন?

মেয়ে। তোমাকে না বলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, তাই শুনিয়া সে গ্রহণ করিল না।

মা মনে মনে কহিলেন,—"ভাগ্যগুণে এমন চাকর পাইয়াছি!"

একমাত্র কন্যা;—প্রাণের অধিক প্রিয়, কন্যার আবদার আকাঙ্ক্ষা, পূরণ করিয়াই মা সুখিনী। চাকরও বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত। তিনি দেখিলেন, চাকর খাবার গ্রহণ করে নাই, তজ্জন্য মেয়ে দুঃখিত হইয়াছে। তখন কোমলহৃদয়া স্নেহরূপিণী জননী কন্যাকে তুষ্ট করিবার জন্য কহিলেন,—"মা, তোর যখন যা মনে চায়, খাবার জিনিস আমার নাম করিয়া চাঁদকে খাইতে দিস্।" মায়ের অবাধ অনুমতি পাইয়া মেয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখিনী হইল, কিন্তু প্রত্যাখ্যান-দুঃখ তাহার সম্যক্ দূরীভূত হইল না। থাকিয়া থাকিয়া বালিকার সে দুঃখ গুমরিয়া ফুঁফিয়া উঠিতে লাগিল।

অনন্তর তারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তাহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিল। সে স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী। পিতার নিকট লেখা-পড়া শিখিয়া এক্ষণে সে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অল্প সময়ে সে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত সুন্দররূপে বুঝিয়া পড়িয়াছে। এই পুস্তক তাহার বড়ই মনোমদ। আজ সে মনের শান্তির জন্য রামায়ণ খুলিয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু মন তাহাতে বসিল না। চাঁদ খাবার গ্রহণ করে নাই,—এ

নিমিত্ত কি যে এক অনাহূত অশান্তির ঝড়ে তাহার কোমলান্তঃকরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বালিকা মনে শান্তি আনয়নের নিমিত্ত ভাবিতে লাগিল—চাকর বইত নয়, সে খাবার ফিরাইয়া দিল তাগাতে কি আসিয়া যায়? সে ক্ষিদেয় কষ্ট পাইবে তাহাতে আমার কি? কিন্তু কাল্পনিক এ সান্ত্বনায় হৃদয় বাগ মানিল না। হৃদয় দেখিল লোকটি কি নির্লোভ! উত্তম উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া মহীযান্ বীরের ন্যায় তাহার কর্ত্তব্যকার্য্যে চলিয়া গেল। তাহাব হৃদয়ে বল কত! প্রভু বা প্রভু-পত্নীর অগোচরে বা তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত সে নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করিল না। সামান্য চাকরেব এমন অসামান্য ন্যায়পরতা! চাঁদের এইরূপ গুণচিন্তায় বালিকা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রীতির সমীরণ-সঞ্চালনে তাহার খাদ্যপ্রত্যাখ্যানক্ষুব্ধ হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল। সে কি যেন মনে করিয়া, পাঠ বন্ধ করিয়া উঠিযা বাগানের দিকে বেড়াইতে চলিল। বাগান তাহার নিত্যানন্দময় লীলাক্ষেত্র। এই সময় পরীক্ষিত ছুটিয়া আসিয়া দিদির আঁচল চাপিয়া ধরিল এবং হাসি-খুসীতে ভরপূর হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ঠাকুর-আঙ্গিনায় বগা কচি-দন্তে কোমল দূর্ব্বাঙ্কুর উত্তোলন করিতেছিল। সে, তারা ও পরীক্ষিতকে দেখিয়া ইতস্ততঃ ধাবন কূর্দ্দন আরম্ভ করিল। পরীক্ষিত তখন ভগ্নীর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বগার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। বালিকা পরীক্ষিত ও বগার ক্রীড়া-কূর্দ্দন দেখিতে দেখিতে

বাগানে উপস্থিত হইল। আশৈশব বাগানের যাবতীয় বৃক্ষের সহিত. বালিকা পরিচিতা। প্রায় সমস্ত বৃক্ষগুলিই বালিকার যত্নে রক্ষিত ও সাময়িক ফুল-ফলে শোভিত। একস্থানে নারিকেল, কাঁটাল, কামরাঙ্গা, হরীতকী ও বেল এই পাঁচটি ফলবান্ বৃক্ষ বৃত্তাকারে অবস্থিত রহিয়াছে। বৃক্ষগুলি যখন চারা ছিল তখন বালিকা স্বহস্তে তাহাদের মূলে আলবাল রচনা করিয়া জল সেচন করিত। এক্ষণে তাহারা বড় হইয়া নূতন ফল প্রসব করিয়াছে, বালিকা বাগানের অন্যান্য বৃক্ষাপেক্ষা এই বৃক্ষগুলিকে অধিক ভালবাসে। অল্পদিন হইল .সে রামায়ণ-বর্ণিত দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীর নামানুকরণে সমস্ত বাগানের নাম 'দণ্ডকারণ্য', আর ঐ পাঁচটি বৃক্ষসমন্বিত স্থানের নাম 'পঞ্চবটী' রাখিয়াছে। বালিকা এই নামকরণের কথা প্রথমে পদ্মার নিকটে প্রকাশ করে। পদ্মা গৃহিণীকে জানায়; গৃহিণী মহামায়া হাসিতে হাসিতে তাহা গৃহকর্ত্তাকে জ্ঞাত করান। গৃহকর্ত্তা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলেন,—"সুন্দর নামকরণ হইয়াছে। এখন রামের মত উপযুক্ত একটি জামাতা আমার তারার ভাগ্যে ঘটিলেই এই নামকরণ সার্থক হইতে পারে।"

বালিকা তাহার সাধের দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে লাগিল; সহসা মনে হইল, রামায়ণের দণ্ডকারণ্যের সহিত তাহার নিজের দণ্ডকারণ্যের কত খানি সাদৃশ্য আছে? সে দেখিল, সে অরণ্যের ফল-মূল তাহার

বাগানে সবই আছে, কিন্তু অভাব—এখানে হরিণশিশু বিচরণ করে না, কোন ঋষি-কুমারেব সমাগমও নাই। এই সময়ে পরীক্ষিত বগাকে তাড়াইয়া লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালিকা বগাকে হরিণ-শাবক কল্পনায় তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই সে মৃগবৎ তীরবেগে মাতৃ-উদ্দেশে ছুটিয়া পলাইল। বালিকা তখন হাসিমুখে পরীক্ষিতের হাত ধরিয়া কহিল,—“তুই আমার এই দণ্ডক-বনের ঋষিকুমার হবি?” শিশু “ইষিকুয়ার হব” বলিয়া নাচিতে লাগিল। বালিকার আবার মনে হইল এখানে ত কলনাদিনী গোদাবরী নাই? পরক্ষণে অদূরবর্ত্তী যমুনার কথা তাহার মনে পড়িল। এইরূপে রামায়ণ-বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের যে অভাব তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল, চিন্তার সহিত পরক্ষণে তাহার সে অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল। সে দেখিল—ঐ ত পঞ্চবটী, ঐ ত লতাবেষ্টিত রসালমূল; আমার দণ্ডকারণ্যে নাই কি? সবই আছে। শেষে সে চিন্তা করিতে লাগিল,—এখন রামসীতা কোথায় পাই? চিন্তার সহিত তাহার মনে হইল বনচারিণী সীতার ন্যায় সেও ত কোকিলের কুহুরব শুনিয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হয়। অপরাহ্ণে ঝিঁঝির নিক্কণে সুর মিলাইয়া গান গায়। এইরূপ ভাবিয়া সে নিজের দ্বারা সীতার অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে ইচ্ছা করিল।

এখন রামের অভাব। রামের অভাব চিন্তা করিতেই

চাঁদের মোহন মূর্ত্তি শারদ-চন্দ্রমার ন্যায় তাহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইল। সভয় লজ্জায় বালিকা শিহরিয়া উঠিল। তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে একটা তীব্রোজ্জ্বল রক্তের আভা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু সে সময় সহসা যখন মনে হইল,—"চাঁদ যে মুসলমান!" তখন তাহার আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তখন সে পার্শ্ববর্ত্তী বকুল-মূল অবলম্বনে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল। এই সময় বিবেক ও প্রেম বালিকার মানসক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।

যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া পাঠক-পাঠিকাকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। মোটের উপর যুদ্ধ অনেকক্ষণ চলিল। শেষে প্রেমেরই জয়লাভ হইল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দণ্ডকারণ্যে ডাবপাড়া।

বালিকা পুনরায় উঠিয়া বাগানে পাদচারণ করিতে লাগিল। এই সময় নারিকেলবৃক্ষের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিল সুন্দর সুন্দর ডাব গাছে ঝুলিতেছে। সে তখন মনে করিল, আজ দ্বিপ্রহরে চাঁদ যখন রৌদ্রে তাতিয়া ঘরে আসিবে, তখন এই ডাবের সরবৎ পান করাইয়া ছাতু-প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ লইব। এইরূপ ভাবিয়া সে বাড়ীর উপর হইতে একখানি আকর্ষী আনিয়া গাছে লাগাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। আকর্ষী-আকর্ষণে তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইয়া গেল। আগুল্ফ-লম্বিত বিনান বেণী সঘন কম্পনে পৃষ্ঠদেশে দুলিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন কৃষ্ণসর্প স্বর্ণলতা অবলম্বনে নারিকেল বৃক্ষে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। আকর্ষী-আকর্ষণে পরিশ্রান্ত হইলেও, বালিকার ললাটে স্বেদবিন্দু উৎপন্ন হইয়া তাহাকে অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া তুলিল। এই সময় বালার্ক-কিরণমালা কুসুমকোমলা নবীনা নধরা বালিকার মোহিনী রূপমাধুরীর দর্শনলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, গোপনে দণ্ডকারণ্যের সংকীর্ণ পত্রব্যবচ্ছেদের মধ্যদিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পতিত

হইল। জ্যোতির সংযোগে জ্যোতির্ম্ময়ী বিনান-কুন্তলা বালিকার রূপের প্রভায় উপবন-বৃক্ষরাজী অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এই সময় একজন যুবক অদূরে খর্জ্জুর বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই মুনিজন-মনোহারী রূপ নিস্পন্দনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিল। বালিকা ডাব পাড়িবার জন্য, আকর্ষীমূল ধরিয়া অনেক্ষণ টানাটানি করিল, কিন্তু একটি ডাবও বৃন্তচ্যুত করিতে পারিল না। যুবক সুযোগ বুঝিয়া এই সময় বালিকার সমীপবর্ত্তী হইয়া ডাকিল—তারা! যুবকের স্বরে আবেগপূর্ণ প্রেম-ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল; পরন্তু সে যেন বালিকার বহুদিনের পরিচিত ব্যথার ব্যথী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যুবকের স্বর বালিকার পরিচিত হইলেও অদ্য তাহা তাহার হৃদয়ে গরল বর্ষণ করিতে লাগিল। সে যুবকের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়াই মাথায় কাপড় দিয়া একটু পশ্চাতে ফিরিয়া অধোবদনে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবক পুনরায় কহিল,—"তারা, ঠাকুর খুড়া বাড়ী আসেনাই কি?"

মৃদুস্বরে বালিকা উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না।"

যুবক। তারা! তুমি আমার কথার উত্তর দিতে আজ্ঞে বল কেন?

বালিকা। আপনারা বড়লোক।

যুবক হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় ভাব আর চাপিয়া রাখিতে পারিল

না। বলিল—"তুমি যে বড়লোকের মাথার মণি, হৃদয়ের আরাধ্য-রত্ন !"

যুবকের কথায় বালিকার অরুণরাগরঞ্জিত কমনীয় বদনকমল তখন ঘৃণার মলিন ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। সে কোন উত্তর করিল না।

যুবক বালিকার তদানীন্তন মুখবিকৃতি দেখিতে বা বুঝিতে পারিল না। আরও বালিকাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিল,—আমার প্রেমময় উক্তি তাহার মনঃপূত হইয়াছে। এইরূপ কাল্পনিক চিন্তার অনুকূলভাবে যুবক হর্ষরোমাঞ্চিত হইয়া কহিল,—"তুমি এত কষ্ট করিয়া ডাব পাড়িতেছ কেন ? তোমাদের না একজন চাকর আছে ? তাহাকে আদেশ করিলেই ত ডাব পাইতে পার।"

তারা অধোমুখে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল,—"সে মাঠে গিয়াছে।"

যুবক সুযোগ বুঝিয়া কহিল,—"আচ্ছা, তবে আমিই পাড়িয়া দিতেছি।" এই বলিয়া যুবক বালিকার পার্শ্বে যাইয়া আকর্ষী ধরিল। বালিকা সঙ্কোচে সাত হাত দূরে যাইয়া দাঁড়াইল। সে অতখানি সরিয়া যাওয়ায় যুবক মনঃক্ষুণ্ণ হইল বটে, তথাপি একে একে চারিটি ডাব বৃন্তচ্যুত করিয়া, বালিকাকে কহিল,—"আরও ডাব পাড়িব কি ?"

তারা ধীরে অথচ মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে না।"

যুবক বলিল,—"আবার আজ্ঞে বলিতেছ ?" বালিকার

মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইল। হাঁ হুঁ কিছুই বলিল না। বালিকা প্রথমতঃ একবার মাত্র যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহে নাই। কারণ সে যুবকের অনাহূত সমাগম ও অন্যায় বচন-বিন্যাসে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। যুবক কিন্তু বালিকার এইরূপ সংকোচ ও নিরুত্তর ভাবই অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল। অতঃপর যুবক কহিল,—"তারা, ডাব কয়টি একসঙ্গে তোমাদের বাড়াতে লইয়া যাওয়ার উপায় কি ?" আবার বালিকা ধীরে উত্তর করিল,—"আমি দুইবারে লইয়া যাইব এখন।"

যুবক। না, না, তাও কি হয়! তুমি এতকষ্ট করিবে কেন? চল, আমি একসঙ্গে ডাব চারিটি লইয়া তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেছি;—এই বলিয়াই যুবক দুই হাতে চারিটি ডাব লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল। অগত্যা বালিকাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যুবক ডাব লইয়া বাড়ীর উপর আসিলে, মহামায়া কহিলেন,—"একি! বাবা, তুমি কোথা হইতে ইহা লইয়া আসিতেছ?" মেয়ে যে বাগানে ডাব পাড়িতে গিয়াছিল, মা তাহা জানেন না।

যুবক। তারা বাগানে ডাব পাড়িতে গিয়াছিল। চারিটি ডাব তাহার পক্ষে বহিয়া আনা কঠিন, তাই আমি লইয়া আসিয়াছি।"

মহামায়া তখন পদ্মাকে ডাকিলেন, পদ্মা একখানা সুন্দর জলচৌকী আনিয়া যুবককে বসিতে দিল। তারা অন্তঃপুরে আসিয়াই ডাব কয়েকটি লইয়া তাহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিল। যুবক আসন পরিগ্রহ করিয়া অন্যূন দশবার আড়-নয়নে তারার ঘরের দিকে চাহিল, কিন্তু সে ঘরে যে জনপ্রাণী আছে তাহা বুঝা গেল না।

যুবক মহামায়াকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মা, ঠাকুর খুড়া কোথায় গিয়াছেন?" মহামায়া মা সম্বোধনে অনেকটা বিস্মিত হইলেন। খুড়ী-মাও নয়, একেবারে মা বলিয়া ডাকা! আবার আহ্বানটিও সহজ নয়—একান্ত ভক্তিপূর্ণ ও আবেগভরা। যেন পেটের ছেলের সম্বোধন। মহামায়া মুখ তুলিয়া যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক সাতিশয় শিষ্টাচার প্রদর্শনপুরঃসর মৃত্তিকায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

মহামায়া কহিলেন,—"বাবা, তিনি গুরুদর্শনে গিয়াছেন।"

যুবক। কবে ফিরিবেন?

মহা। এক পক্ষ হইল গিয়াছেন, আজ কালের মধ্যেই আসিবার সম্ভব।

যুবক। সত্বর আসিলে হয়। দিল্লীর খেরাজ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেক পরামর্শ আছে। বাদশা পারস্যদেশ জয় ও চীন দেশ অধিকারে মনস্থ করিয়া আমার বাকী খেরাজ আদায়ের জন্য কড়া হুকুম জারী করিয়াছেন।

মহামায়া একথার পৃষ্ঠে কোন কথা না বলিয়া কহিলেন,—

"বাবা, তোমার মা ভাল আছেন? সেই যে দোলের সময় তোমাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তার পর আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। দেবযানীর বিধবা হওয়ার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া না জানি তোমার মা কতদূর মনঃকষ্টে আছেন?"

যুবক। আজ্ঞে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? মা হত-ভাগিনীর জন্য অন্ন-জল ত্যাগ করিয়াছেন। এখন মনে হয়, সে যদি সহমরণের ভয়ে পলাইয়া না আসিত, ভাল ছিল। এখন সে মায়ের চোখের উপর আসিয়া তাঁহার দুঃখ শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

মহা। বাবা, এর উপায় নাই। তুমি একমাত্র পুত্র—মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিও।

যুবক আর কিছু বলিল না। মহামায়াকে প্রণাম করিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইল। মহামায়া শিষ্টাচার জানাইয়া কহিলেন,—"বাবা, প্রণামের আবশ্যক কি? ভগবান্ তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।" ইতঃপূর্ব্বে যুবক আর কখন মহামায়াকে প্রণাম করে নাই।

যুবক অন্দর হইতে বহির্গত হইয়া ঠাকুর-আঙ্গিনার নিকটে আসিয়া পুনরায় অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আশা—তারার দর্শনলাভ। কিন্তু দুষ্ট চক্ষু অকারণমুগ্ধ হৃদয়কে প্রতারিত করিল।

তখন বালিকার ব্যবহার রমণী-জনসুলভ ব্যবহারের বিপরীত

ভাবিয়া, ক্ষুব্ধতা-মিশ্রিত হিংসার তীব্রতায় তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যুবক একান্ত হতাশচিত্তে ঠাকুর-আঙ্গিনা অতিক্রম করিল।

যুবকের হৃদয় বায়স্কোপের ক্রীড়াকৌতুকের ন্যায় পলকে পরিবর্ত্তনশীল। নিরাশার দাবদাহ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। নিমেষে আশার ইন্দ্রধনু তাহার চিত্তাকাশে আবার বিকশিত হইয়া উঠিল। প্রেমোন্মত্ত হৃদয়ের উন্মাদিনী আশা তাঁহাকে পুনরায় প্রলুব্ধ করিয়া কহিল,—আর একটিবার ফিরিয়া চাও, এবার তোমার আরাধ্য প্রতিমার সুধাংশু-নিন্দিত বদন নয়ন-গোচর হইবে। যুবক তারাদের বাড়ীর তোরণ-পার্শ্বস্থ দেবদারু-তলে দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে আবার ফিরিয়া চাহিল, এবার সত্যই চণ্ডীমণ্ডপের বেড়ার পাশে একটি রমণীমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইল। দেখিয়া যুবক ভাবিতে লাগিল—হায়, আমি অকারণ প্রাণপ্রতিমার স্বভাবে দোষারোপ করিয়াছি। আমার প্রতি ভালবাসা না জন্মিলে সে সহজে মায়ের সাক্ষাতেই আমার দৃষ্টিপথে আসিত। কিন্তু এখন বুঝিলাম পূর্ব্বরাগের চিরশত্রু লজ্জা তাহাকে আসিতে দেয় নাই; তাই মায়ের অসাক্ষাতে নির্জ্জনে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত বেড়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবক প্রেমবিস্ফারিত নয়নে কল্পিত মানস-প্রতিমার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি যোজনা করিতেই রমণীমূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া কহিল,—“রাজপুত্র, বাড়ীর উপর কি কিছু রাখিয়া গিয়াছেন?” হায়! এ যে পদ্মা, এ যে বাড়ীর চাকরাণী! প্রয়োজন-

বশে চণ্ডীমণ্ডপের বেড়ার পাশে আসিয়াছে। যুবক আহম্মকের একশেষ হইল; শেষে বিবেকের পীড়নে নিরাশার কশাঘাতে মর-মর হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

হায়! অবৈধ অনুরাগ, তোমার মত্ততায় যুবজনের এ দুর্গতি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:0:-

অঙ্গুলি কর্ত্তন।

যুবক চলিয়া গেলে মহামায়া পদ্মাকে কহিলেন —"সুন্দর ছেলেটি, বেশ স্বভাব। আমার তারার সহিত মানায় ভাল কিন্তু—"

এই সময় তারা তাহার পাঠঘরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; মহামায়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইয়া মেয়ের ঘরে প্রবেশ করিলেন; পদ্মাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। ঘরের মেজে রক্তস্রাবে আর্দ্রীভূত হইয়াছে। মেয়ে দা দিয়া ডাব কাটিতে বসিয়া বাম হাতের একটি আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছে। মহামায়া 'ওমা, কি হইল!' বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। পদ্মা ক্ষিপ্রহস্তে মেয়ের আঙ্গুলে জলপটী বাঁধিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রক্ত পড়া বন্ধ হইল। অনেকক্ষণ পরে মেয়ে কিছু সুস্থ হইল। মা তখন একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"তুই যদি ডাবের জল খাইবি, তবে পদ্মাকে বলিলেই ত সে ডাব কাটিয়া দিত।"

অমলহৃদয়া বালিকা কহিল,—"আমি খাইব না, ভাইকে দিবার জন্য ডাব কাটিতেছিলাম।"

মা। "এই ভোরে তাকে দই ছাতু খাওয়াইতে গিয়াছিলি,

আবার ডাবের জল! ছিঃ! চাকরের প্রতি অতখানি ভালবাসা দেখান কি ভাল দেখায়?" কথাটি যেরূপভাবে বলা হইল, তাহাতে অবশ্য শ্লেষের কোন নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু তারার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা অনিবার্য্য সন্দেহ ও লজ্জার ঝাপ্সা যুগপৎ আসিয়া তাহার মুখমণ্ডলকে আজ মলিন করিয়া ফেলিল। সে, আঙ্গুল টাটাইতেছে বলিয়া উপবেশন-স্থানেই শয়ন করিল। পদ্মা নিকটে বসিয়া অঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ জলসিক্ত করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এ যুবক কে?

যুবকের পরিচয়প্রসঙ্গে পাঠান রাজত্বের আংশিক বিবরণ বিবৃত করা আবশ্যক হইতেছে। পাঠান রাজত্বের সময় প্রাদেশিক নবাব, ফৌজদার ও দেশমুখ্যগণ দেশ শাসন ও কর আদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং স্ব স্ব দেয় কর যথাসময়ে দিল্লীতে পাঠাইতেন। বাদশাগণের উদারতা ও অপক্ষপাতিতাগুণে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উল্লিখিতরূপ শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইতেন। সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক শাসনসৌকর্য্যার্থে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য যে ত্রয়োবিংশতি ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার মধ্যে অমরাবতীর কিয়দ্দূরে যাজনগরে অজয়রাম মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অজয়রামের ন্যায় ইষ্টসাধনতৎপর পাষণ্ড প্রকৃতির লোক সংসারে বড় দেখা যায় না। উক্ত ত্রয়োবিংশ প্রদেশমধ্যে যাজনগর ক্ষুদ্রতম হইলেও অজয়রাম অত্যাচারে অন্যান্য সমস্ত শাসনকর্ত্তাকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। খাজনার অছিলায় বাজনা আদায়ে তিনি প্রজার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিতেন, তেমন অমানুষিক অত্যাচার

করিতে মানুষে কখন পারে না। পরন্তু ইতিহাসে তাদৃশ নির্ম্মম শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না। তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব পীড়নে কত লোক যে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। তাঁহার ঘোর অন্ধকার কারাগৃহে খাজনার দায়ে আবদ্ধ হইয়া বংশডলা, প্রস্রাব পান, পাথরচাপা, উর্দ্ধীকরণ প্রভৃতি পীড়নে, কত লোক যে হাহা রবে, অঃঃ, উঃ, করণে গগন মেদিনী শোকার্ত্ত করিয়া তুলিত, শেষে ভবলীলা সাঙ্গ করিত, তাহা কে বলিবে?

অজয়রামের বার্ষিক দেয় কর আড়াই লক্ষটাকা মাত্র ছিল। এ টাকাও তিনি যথানিয়মে দিল্লীতে পাঠাইতেন না। গড়ে তিন চারি বৎসরের খেরাজ সর্ব্বদাই বাকী থাকিত। দিল্লী হইতে তলব তাগাদা আরম্ভ হইলে ধূর্ত্তশিরোমণি অজয়রাম, প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে যথোচিত উৎকোচ ও উপঢৌকন দান করিয়া তলব তাগাদার হাত হইতে নিস্তার লাভ করত নিশ্চিন্ত থাকিতেন। অজয়রাম প্রজালোকের নিকট মহারাজ নামে পরিকীর্ত্তিত ছিলেন। না থাকিবেন কেন? বর্ত্তমান সময়েও আমাদের দেশের অনেক হিন্দু জমিদার মহারাজাদি ভূষণে ভূষিত আছেন।

ঐশ্বর্য্যশালী স্বাধীন ভূপতির রাজপ্রাসাদ তুল্য অজয়রামের বাড়ী আড়ম্বরপূর্ণ এবং তাঁহার অন্তঃপুরমহল কুবেরের পুরী সদৃশ মনোহর ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই মোহন পুরীর অট্টালিকার ইষ্টক গাঁথনীর মাল-মসলা প্রজার রক্তে অনুরঞ্জিত ছিল।

অজয়রাম আবার অন্যদিকে সাধু-বেশাবৃত ব্যাধের ন্যায়

নিষ্ঠাবান্ আচারশুচি ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে ধর্ম্ম ভাগে বারমাসে, তের পার্ব্বণে তেত্রিশ কোটি দেবতার ভোগোৎসব হইত। এই সকল উৎসব-মধ্যে দোলোৎসব সর্ব্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।

আমাদের গঙ্গারাম ঠাকুর মহাশয় বাদশাহের প্রিয়পাত্র। সুচতুর অজয়রাম এই কারণে তাঁহার সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় বয়োজ্যেষ্ঠ অজয়রামকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন।

মহারাজ অজয়রামের একমাত্র পুত্র রঘুরাম পরম সুন্দর যুবক। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। প্রতিবৎসর দোলের সময় আমাদের ঠাকুর মহাশয় সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া অজয়রামেয় বাড়ীতে আসিতেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থান করিতেন। এই উপলক্ষে তারার মুনিজন-মনোহারী রূপ রঘুরামের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোবিকার উপস্থিত হয়। কিন্তু কিরূপে সে তাহাকে লাভ করিবে তাহার উপায় ভাবিয়া পায় না।

গোত্রানুযায়ী বিবাহের প্রতিবন্ধক না থাকিলেও রঘুরাম দেশমুখ্য মহারাজের পুত্র, তারা দরিদ্রের কন্যা। সুতরাং এ বিবাহের কথা রঘুরাম কেমন করিয়া মুখ দিয়া বাহির করিবে। অথবা ভিন্ন লোক দ্বারা বিবাহের কথা প্রকাশ করিলেও তাহার মাতা পিতা দরিদ্রের ঘরের কন্যা আনিতে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। এইরূপ নানাদিক্ ভাবিয়া রঘুরাম মনের উচ্ছ্বাস-আবেগ-পূর্ণভাব অতিকষ্টে প্রশমিত করিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে রাঘুরামের বিবাহের পূর্ব্বেই হঠাৎ অজয়রামের কাল হইল। পিতার মৃত্যুর পর রঘুরাম দেশমুখ্য পদলাভ করিল, সে পিতৃ-পন্থানুসরেণ বারমাসে তের পার্ব্বণ স্থির রাখিতে লাগিল; পরন্তু প্রজাপীড়নে, পিতার অনুষ্ঠিত পৈশাচিক প্রণালীরও ব্যতিক্রম করিল না।

মনের মতলব সিদ্ধির নিমিত্ত রঘুরাম পিতার মৃত্যুর পর দোলোৎসব ক্রিয়া মহাড়ম্বরে আরম্ভ করিল এবং ঠাকুর-পরিবারকে সাতিশয় সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিল। তাঁহারা আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দুই তিন দিন অবস্থান করিলেন। এবার লাবণ্য-কোহিনুর তারার রূপে রঘুরাম আত্মহারা হইয়া পড়িল এবং তাহার সহিত প্রণয় স্থাপন মানসে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা তারাকে নির্জ্জনে পাইয়া রঘুরাম তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং প্রেম-সম্ভাষণে কহিল—"তারা, রাজঘরণী হইতে তোমার ইচ্ছা হয় না?" তারা ভয়ে জড়সড় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুরাম সাহস পাইয়া পুনরায় কহিল—"তারা, আমি তোমাকে প্রাণাধিক ভালবাসিয়াছি।" এই সময় মহামায়া গৃহান্তর হইতে ডাকিলেন—"তারা!" তারা বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

যাহা হউক, এইরূপে রঘুরামের সহিত ঠাকুর-পরিবারের জানা শুনা পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং সেই সূত্রে ডাব পাড়িয়া দেওয়ার দিন তারার সহিত কথোপকথন করিতে রঘুরাম সাহস পাইয়াছিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ডাবের সরবৎ—অমূলক আশঙ্কা।

চাঁদ দ্বিপ্রহরে আতপক্লিষ্ট হইয়া ঘরে আসিল। তাহার মাথায় বস্ত্রাবৃত গুরুভার বোঝা। সে বোঝা লইয়া একছার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহামায়া দেখিয়া কহিলেন,—"চাঁদ, তোমার মাথায় ও কি ?" এই সময় পদ্মা যমুনায় জল আনিতে গিয়াছিল।

তারা আঙ্গুলের বেদনায় কাতর হইয়া তাহার পাঠঘরেই শুইয়াছিল। 'চাঁদ'শব্দে সে বেদনা ভুলিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। চাঁদের নিকট আসিবার তাহার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু মায়ের পূর্ব্বাহ্ণের তিরস্কার স্মরণ হওয়ায় তাহার হস্ত পদ অবসন্ন হইয়া আসিল। তথাপি সে চাঁদমুখ দেখিতে জানালা দিয়া তাকাইল।

চাঁদ ধীরে অতি কষ্টে মাথা হইতে বোঝা নামাইয়া দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারান্দায় রাখিল এবং মহামায়াকে অনুচ্চস্বরে কি যেন কহিল। মহামায়া বস্ত্র উন্মোচন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়পুলকে উৎফুল্ল হইয়া চাঁদের মুখের দিকে চাহিলেন। চাঁদ কহিল,—"আমাদের ইটখোলার ক্ষেত খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহা

পাইয়াছি। কর্ত্তা আসিলে জানাইবেন।” এই বলিয়া সে বাহির-বাড়ী চলিয়া গেল।

মহামায়া তখন কন্যাকে ডাকিলেন—“তারা, এ ঘরে আয়।” তারা চলিয়া আসিল এবং মায়ের আদেশে বস্ত্র মোচন করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সেও হর্ষাতিশয্যে অনেকক্ষণ নিরুদ্ধ-বাক্ হইয়া রহিল। শেষে কহিল,—“ভাই ইহা কোথায় পাইয়াছে মা?”

মা। আমাদের ক্ষেতে।

অতঃপর মা মেয়েকে কহিলেন,—“পদ্মা ঘাটে গিয়াছে, তুই এখন ডাবের শরবৎ তৈয়ার করিতে পারিবি কি? চাঁদ বড় তাতিয়া আসিয়াছে।” মেয়ে আহ্লাদে সম্মতি জানাইল।

চাঁদ যমুনা হইতে স্নান করিয়া আসিল। তারা ডাবের সরবৎ লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

চাঁদ। দিদিমণি, গ্লাসে ও কি?

তারা। খাইয়া দেখ।

চাঁদ। না বলিলে খাইব না।

তারা গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বিলোল কটাক্ষে কহিল,—“এখন আর ফিরাইয়া দিলে চলিবে না। মা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন ‘আমার অনুমতি থাকিল, তোর মনে যখন যা চায়, তোর ভাইকে খাইতেদিস্’।” চাঁদ জানে, তারা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। এইরূপ ভাবিয়া সে হাত বাড়াইল। তারা হাত বাড়াইয়া গ্লাস দিতেই তাহার কাটা আঙ্গুলের নেকড়ার

প্রতি চাঁদের দৃষ্টি পড়িল। চাদ কহিল,—“দিদিমণি, আঙ্গুলে নেক্‌ড়া জড়াইয়াছ কেন? কি হইয়াছে?” প্রেমগর্ব্বে ফুলিয়া তারা কহিল,—“অত খোঁজে তোমার দরকার কি?” তারার একথা বলিবার উদ্দেশ্য—তোমার জন্য আমার সমস্ত আঙ্গুলকাটা গেলেও তোমাকে জানিতে দিব না, একটি আঙ্গুল কাটাত তুচ্ছ কথা। কিন্তু চাঁদ তারার মুখের চেহারা বা কথার ভাবের দিকে লক্ষ্য করিল না—বুঝিল না। সে ভাবিল—বয়স্থা বালিকা, তাহার হাত-পার সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কি অধিকার আছে? আমি সামান্য চাকর বইত নই? চাঁদের নিষ্পাপ ধর্ম্মভীরু হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মুখ এতটকু হইয়া গেল।

তারা কহিল, “অমন হইলে কেন? ধর, সরবৎ খাও।” চাঁদ কম্পিত হস্তে সরবৎ গ্রহণ করিয়া কহিল,—“দিদিমণি, আমার অপরাধ হইয়াছে। মাপকর।” তারা ঈষদ্ধাস্যে কহিল,—“আগে সরবৎ খাও, পরে মাপ করিব।” চাঁদ কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত যাইয়া একচুমুকে গ্লাসের সমস্তটুকু সরবৎ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল।

তারা জিজ্ঞাসা করিল,—“কি মাপ করিব?”

যে কথা মনে করিয়া চাঁদ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা সে তারাকে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তারা শুনিয়া বুঝিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তিবৎ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পাঠক, তারার এই অসাময়িক বা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার কারণ বলিতে পারেন কি? আমাদের অনুমান হয়,

চাঁদের কথায় বালিকা ভাবিতেছে,—একাদিক্রমে দিনরাত সেবা সাধনা করিয়া যাঁহার হৃদয় পাইতেছি না, সময় সময় যাহার অন্তর নীরস মনে করিয়া দগ্ধ হইতেছি, আজ তাহার একটি কথায় সব বুঝিতে পারিলাম। ওঃ! সে আমাদিগকে এত ভয় করিয়া চলে? আমাদিগের সহিত কথা বলিতে জিহ্বা এত সংযত করিয়া লয়? আজ বুঝিতে পারিলাম, সে আমার দিকে মাথা তুলিয়া চায় না কেন? আমার সেবা-সাধনার অনুকূলে একটিও প্রাণারাম কথা বলে না কেন? হায় চাঁদ! এখন যদি তোমাকে হৃদয় চিরিয়া দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে কেন আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়াছি—কেন তোমাকে তাহা বলিতে চাই না।

শিশুর ন্যায় সরল চাঁদ কিন্তু তারার বিমর্ষতায় আরও ভীত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, আঙ্গুলে নেকড়া জড়ানের কথায় তারা না জানি মনে কত ব্যথা পাইয়াছে, কতই অপমান বোধ করিয়াছে। তাই সে ভীতিমিশ্রিত বিনয় সহকারে আবার কহিল,—"দিদিমণি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর কখন তোমাদের নিজস্ব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।" তারা দেখিল হিতে বিপরীত হইতে চলিল। ভাবিল—চাঁদ যেরূপ সত্যবাদী, হয়ত অতঃপর সে আমার সহিত আর কথাই বলিবে না। হায়, আমি নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিলাম! আবার ভাবিল—আর কেন? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে এক কলসী সোণার টাকা লইয়া মার হাতে দিয়াছে। তাহার এই নির্লোভ মহত্ত্বমূলে এখনই সর্ব্বস্ব বিকাইব। এইরূপ

আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রেমের বাঁধ ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এই সময় চাঁদ পুনরপি কহিল,—"দিদিমণি, আমার অপরাধ যদি ক্ষমা না কর, তবে আজই তোমাদের বাড়ী হইতে পলায়ন করিব।" হায়, এ যে মরার উপর খাঁড়ার ঘা এইবার বুঝি সত্যসত্যই বালিকার লজ্জার স্বর্ণ-প্রস্তরে গ্রথিত প্রেমের বাঁধ ধ্বসিয়া যায়? কিন্তু বিধাতা সৃষ্টির কোন্ উপাদানে যে রমণী-হৃদয় গড়িয়াছেন, তাহা বিধাতাই জানেন। এমন অবস্থাতেও বালিকার মুখ ফুটিল না। কেবল বাধ বাধ জড়িত কণ্ঠে কহিল,—"ও কি কথা বলিতেছ চাঁদ?" বলার সঙ্গে সঙ্গে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে ভাবিল—হায়, কি বলিলাম। ছি ছি! হৃদয়ের সব কথাই ত বলা হইল। বালিকা এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া চোখে মুখে কাপড় দিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রেমের হৃদয়ে প্রথম প্রেমের আহ্বান এমনি লজ্জা-জনক—এমনি সন্দেহমূলক বটে।

এ দিকে চাঁদ ভাবিতে লাগিল,—বালিকা এতদিন আমাকে ভাই বলিয়া ডাকিয়াছে, ভ্রমেও কোন দিন নাম ধরিয়া ডাকে নাই। আজ পরিষ্কার ভাবে নাম ধরিয়া আহ্বান করিল। এরূপ উক্তিতে আমার প্রতি তাহার নিশ্চয়ই ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া যদি আমার বিরুদ্ধে কথা লাগায়, তবে আরও লজ্জা ও বিপদের কথা। চাঁদ যারপর নাই উদ্বিগ্নচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিল।

তারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার নির্জ্জন পাঠগৃহে প্রবেশ করিল। সামান্য ঘটনায় তাহার হৃদয়ে আজ দাবানল জ্বলিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল—হায়, কেন মুখ ফুটিয়া হৃদয়ের কথা জানাইলাম। সে যদি আমাকে স্বৈরচারিণী মনে করিয়া থাকে? হায়, আর যে তাহাকে মুখ দেখাইতে পারিব না! বালিকা তাহার পাঠের চৌকীতে শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

সারাদিনে তারা আর অন্দর হইতে বাহিরে আসিল না। চাঁদও বাড়ীর মধ্যে যাইতে আর সাহস পাইল না। কিন্তু তারার বাহির না হওয়ায় চাঁদ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর মহাশয় গুরুগৃহ হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিতে মহামায়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এত বিলম্ব হইল কেন?”

স্বামী। গুরুগৃহে মিহির-পূজা ছিল। প্রভু আমাকে সেই উৎসবের শৃঙ্খলা-বিধানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

স্ত্রী। উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত?

স্বামী। গুরুদেব আমার ধর্ম্মের অবতার। তাঁহার ব্যাপারে কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে!

স্ত্রী। শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলে, তাহার কি শুনিয়া আসিলে?

স্বামী। যাহা শুনিয়া আসিলাম, তাহার কোন লক্ষণই দেখিতেছি না।

স্ত্রী। কি শুনিয়া আসিয়াছ তাহা শুনিতে পাইব না কি? মন বড়ই উতলা হইয়াছে।

স্বামী। মেয়ে রাজ্যেশ্বরী হইবে।

স্ত্রী। সত্যই?

স্বামী। গুরুদেব ত গণিয়া তাহাই বলিয়াছেন।

স্ত্রী শুনিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠিলেন, হর্ষোচ্ছ্বাসে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। স্বপ্ন-চিন্তাতীত সুসংবাদে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এমন সুসংবাদে কোন্ মাতা না এরূপ আত্মহারা হন ?

স্বামী। অবাক্ হইলে যে ?

কিয়ৎকাল পরে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে স্ত্রী কহিলেন,—"তুমি কি গুরুদেবের গণনায় অবিশ্বাস করিতেছ ?"

স্বামী। না। কিন্তু বিশ্বাসের কোন নিদর্শনও দেখিতেছি না।

স্ত্রী। আমি পূর্ব্ব হইতেই সৌভাগ্যের দুই একটা নিদর্শন মেয়ের চোখে মুখে দেখিয়া আসিতেছিলাম। তুমি বাড়ী হইতে যাওয়ার পর আরও দুইটি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছি।

স্বামী। (স্মিতমুখে) কি নিদর্শন দেখিতে পাইয়াছ ?

স্ত্রী। তুমি এক সময় সামুদ্রিক গণনায় মেয়েদের রাজরাণী হওয়ার যে সকল চিহ্নের কথা বলিয়াছিলে, আমার তারার শরীরে তা'র সবগুলি চিহ্নই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বামী। বল না কি চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছ।

স্ত্রী। তারার আমার মাথার চুল পায়ে পড়ে। হাত-পায়ের নখগুলি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। হাতের তালুতে ও নাভীমূলে পদ্ম-চিহ্ন আঁকা, ডাগর ডাগর চোখ দুটা পদ্মের মত। শরীরে পদ্মের গন্ধ। মোটকথা, মেয়ের আমার সর্ব্ব শরীরে রাজরাণীর চিহ্ন

রহিয়াছে। স্নানের সময় মেয়ের রূপে দুধসাগর (পুষ্করিণীর নাম) উজালা হইয়া উঠে।

স্বামী। আর কিছু নিদর্শন পাইয়াছ কি?

স্ত্রী। তুমি বৃন্দাবনে যাওয়ার দুই দিন পরে ভোররাত্রিতে আমি একটি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তুমি আমি উভয়ে জামাই-বাড়ী উপস্থিত হইয়াছি। শত শত দাসী আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া অন্দরে লইয়া গেল। জামাই-বাড়ীর শোভা-সম্পদের কথা তোমাকে কি বলিব! আমাদের রঘুরাম মহারাজের বাড়ীর চেয়েও সে বাড়ী সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। মেয়ে যে কাপড়-চোপর গহনা পরিয়া স্বামীর ঘর করিতেছে, তাহাতে আমার চোখ ধাঁধিয়া গেল। আমি মেয়েকে প্রথমে চিনিয়াই উঠিতে পারিলাম না। তুমি যে বাদশা-পরিবারের আচ্‌মানী রং‌এর পেশোয়াজ, ফিরজা রং‌এর ওড়নার গল্প করিয়াছ, মেয়েকে সেইরূপ পোষাকে শোভিত দেখিলাম। আরও দেখিলাম, মেয়ের লম্বিত চুলের বেণী বেষ্টন করিয়া মুক্তার মালা দুলিতেছে। চোখের কোণে সুরমা, হাতের তালুতে বিজলীচমক আলতা লাগান আছে। পায়ে জরীর জুতা রহিয়াছে।

ঠাকুর মহাশয় এতক্ষণ স্ত্রীর স্বপ্নের কথা সোৎসুকে শুনিতেছিলেন। জুতা পায়ের (১) কথা শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার সুন্দর মুখ মলিন হইয়া গেল। মহামায়া কথার ঝোঁকে ও অস্পষ্ট দীপালোকে স্বামীর ভাবান্তর উপলব্ধি করিতে

---

(১) হিন্দু মেয়েরা জুতা ব্যবহার করে না।

পারিলেন না। তিনি আরও কহিলেন,—"মেয়ে আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য কয়েকটি দাসীকে ডাকিল। দাসীরা কি যেন এক কথায় মেয়েকে সম্মান জানাইয়া নতশিরে যোড়হাতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।"

স্বামী। কিরূপ কথা কিছুই মনে নাই কি ?

স্ত্রী। ভালমত স্মরণ হয় না। গম্ ছগম না কি যেন বলিয়াছিল।

ঠাকুর মহাশয় একটুকু চিন্তা করিয়া শঙ্কাকুলিত কাতরকণ্ঠে সহসা বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্, দরিদ্র ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিও।"

সরলা মহামায়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ওকি বলিতেছ ?"

স্বামী। তোমার স্বপ্নের গম্ ছগম কথা কি বেগম নয়, মহামায়া ?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ, তাইত মনে হইতেছে। বেগম কথাই দাসীরা যেন বলিয়াছিল।

স্বামী। তবেই দেখ তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে মেয়ে যে বাদশাহের গৃহিণী হইতেছে। এমন হইলে আমার জাতি থাকিবে কেমন করিয়া মহামায়া ?

স্ত্রী। তুমি বল কি! হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের গৃহিণী হওয়ার কথা ত কোথাও শুনি নাই।

স্বামী। তুমি জান না মহামায়া; কিন্তু অনেক হইয়াছে।

স্ত্রী। অসম্ভব কথা!

স্বামী। আমি সত্য কথাই বলিতেছি। গুজরাটের রাজা করণ রায়ের পাটরাণী কমলাদেবী সম্রাট্ আলা উদ্দীনের ধর্ম্ম-পত্নীরূপে গণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেখাদেখি কাম্বের রূপবতী বিশ হাজার অনূঢ়া হিন্দু-বালিকা মুসলমান পতি গ্রহণ করেন। (১) আবার কমলা দেবীর কুমারী কন্যা দেবলা, সম্রাট্-পুত্রের প্রেমাসক্ত হইয়া শেষে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং অলৌকিক পতিভক্তির পরিচয় দেন।

দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী অন্তঃপুরচারিণী সরলা মহামায়া স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"ছি! ছি! কি ঘৃণার কথা! ইহারা মুসলমানকে পতিত্বে বরণ করিল?"

স্বামী। প্রেম আত্মম্ভরিতায় অন্ধ। তাহার নিকট দেশ কাল পাত্রাপাত্র জাতি বিচার নাই।

স্ত্রী। যে প্রেম জাতি নাশ করে, সে প্রেমের মুখে ঝাঁটা।

স্বামী। তা'ত ঠিক; কিন্তু আমার যেন মনে হয় তারাও কোন বাদশা বা নবাবের ঘরে যাইবে।

এই বলিয়া তিনি কন্যার রাজ্যেশ্বরী হওয়া সম্বন্ধে গুরুর সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীর নিকট সবিস্তারে কহিলেন।

স্ত্রী। মেয়ের রাজ্যেশ্বরী হওয়ার সম্বন্ধে গুরুদেব শেষে

---

(১) ইতিহাসবেত্তা ওয়াসেফ এ ঘটনার প্রমাণ দিয়াছেন।

যাহা কহিয়াছেন তাহাই হইবে। হিন্দুর মেয়ে হিন্দুরাজার ঘরেই যাইবে। তাহারও এক নিদর্শন আজই পাইয়াছি।

ঠাকুর মহাশয় সোৎসুকে কহিলেন,—“কি নিদর্শন পাইয়াছ মহামায়া ?”

স্ত্রী। মহারাজ রঘুবাম সকাল বেলা আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন ?

স্বামী। (সবিস্ময় হর্ষে) ঠিক না কি ? কি নিমিত্ত আসিয়াছিলেন ?

স্ত্রী। ঠিক ত বটেই, আরও কিছু আছে।

স্বামী। সে কি ?

স্ত্রী। আমাকে একদম মা বলিয়া ডাকা আর গড় হইয়া প্রণাম করা। এরূপ আর কখন দেখি নাই !

স্বামী। বটে !

স্ত্রী। শুধু ইহাই নহে। মেয়ে সকালে বাগানে ডাব পাড়িতে গিয়াছিল, সেখানে তাহার সহিত মহারাজের দেখা হয়। মেয়ে ডাব পাড়িতে না পারায়, নিজের ডাব পাড়িয়া দেওয়া, ডাব নিজের বহিয়া বাড়ীর উপর আনা। তারা তাহার পাঠঘরে প্রবেশ করিলে সেই ঘরের দিকে পুনঃপুনঃ চাওয়া। আবার চলিয়া যাইবার সময় বাড়ীর দিকে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা।

স্বামী। ইহাতে কি হইল মহামায়া ?

স্ত্রী। এ সকল বিষয় পদ্মাও বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া আমাকে বলিয়াছে যে, মেয়ের প্রতি মহারাজের ভালবাসার

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এখন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে বিবাহ হইতে পারে।

স্বামী। তা' কি হবে? দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কি তিনি বিবাহ করিবেন?

স্ত্রী। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে আমাদের আশা সফল হইবে। আর নারায়ণের কৃপায় যদি আশা পূর্ণ হয়, তবে বাদশা নবাবের ঘরে মেয়ে যাইবে এ আশঙ্কারও কোন কারণ থাকিবে না।

স্বামী। রাজা মহারাজেরা যেমন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সম্পদের পক্ষপাতী, বাদশা নবাবেরা তেমনি সম্পদ্ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য বেশী ভালবাসেন।

স্ত্রী। মেয়েকে ত কোন নবাব বাদশা দেখেন নাই?

স্বামী। না দেখিলেও মেয়ের রূপ দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে।

স্ত্রী। তোমার পণ্ডিতী যুক্তিতর্ক এখন রাখিয়া দেও! আমার মেয়ের রাজরাণী হওয়ার আর একটি গুপ্ত লক্ষণ তোমাকে দেখাইতেছি। এই চাবী লইয়া সিন্ধুক খুলিয়া দেখ।

এই বলিয়া মহামায়া একতোড়া চাবি ঠাকুর মহাশয়ের হাতে দিলেন। ঠাকুর মহাশয় সিন্ধুক খুলিয়া কলসীপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"ইহা কোথায় পাইলে?"

মহামায়া কহিলেন, "চাঁদ ইটখোলার ক্ষেত খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহা পাইয়াছে।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

তারার আত্মসমর্পণ।

ঠাকুর মহাশয় স্ত্রীকে আর কিছু বলিলেন না। উপস্থিত প্রসঙ্গ ত্যাগ কবিয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—দুঃখী কৃষাণ চাকর, অতগুলি স্বর্ণমুদ্রা হাতে পাইয়া নিজে গ্রহণ করে নাই, বড়ই বিস্ময়ের কথা! সামান্য লোক এত নির্লোভ! এত প্রভুগত প্রাণ! এত আত্মত্যাগ! এমন ত কখন দেখি নাই! আবার ভাবিলেন—হয়ত মাটী খুঁড়িয়া অনেকগুলি কলসী পাইয়াছে, সবগুলি গোপনে আত্মসাৎ করিয়া কেবল আমাদের বিশ্বাস ও মনস্তুষ্টির জন্য একটি মাত্র কলসী আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এবম্বিধ চিন্তা অধিকক্ষণ তাঁহার উদার অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন,—সামান্য ভৃত্য হইলে কি হয়? ঈশ্বর যাঁহার হৃদয় মহান্ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব সময়ে মহান্ই থাকিবেন। পার্থিব সম্পদ্-লোভে তাঁহার হৃদয় কখনই কলুষিত হইতে পারে না। এতকাল ধরিয়া আমার সংসারে আসিয়াছে এক দিনের নিমিত্তও ইহার চরিত্রে বা ব্যবহারে কোন দোষ দেখি নাই। হাট-বাজারে জিনিস-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ে এক কপর্দ্দক লইয়াও এই যুবক অবিশ্বাসের কার্য্য

করে নাই, সুতরাং এ যে স্বর্ণকলসীগুলি আমাকে না দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে ইহাও মনে হয় না। যাহা হউক, প্রত্যূষে পরীক্ষা করিলেই সব বুঝিতে পারিব।

পর দিন অতিপ্রত্যূষে—পরিজনবর্গ নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর মহাশয় ইটখোলায় যাইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একস্থানে কতকগুলি ইষ্টকমিশ্রিত মৃত্তিকা চতুর্দ্দিকে স্তূপীকৃত হইয়া আছে এবং তাহার মধ্যে অনতিপরিসর গভীর গোলাকার একটিমাত্র গর্ত্ত রহিয়াছে। ঠাকুর মহাশয় স্পষ্ট বুঝিলেন এখান হইতেই কলসী উত্তোলিত হইয়াছে এবং এই গহ্বরে একাধিক কলসী থাকা অসম্ভব। গুণগ্রাহী ঠাকুর মহাশয় তখন ভৃত্যের অসামান্য বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগে নিঃসন্দেহ হইয়া বিস্ময়পুলকিত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মণ্ডপমন্দিরের অলিন্দে যাইয়া উপবেশন করিলেন। চাঁদ পূর্ব্বদিনের তারার সহিত কথোপকথনে কাল্পনিক আশঙ্কায় যেরূপ অস্থির হইয়া রহিয়াছে, পাঠক তাহা অবগত আছেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর মহাশয় ভৃত্যকে ডাকিলেন—"চাঁদ!" চাঁদ "আজ্ঞা" বলিয়া ভয়ে ভয়ে নিকটে উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় কহিলেন,—"তোমাকে আর আমার চাকরী করিতে হইবে না।" আকাশের চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমনটি হয়, চাঁদের চাঁদমুখখানি তেমনি বিষাদে মলিন হইয়া পড়িল। সে ভাবিল,—হায়, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল; চাকরীটি

গেল, সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া শিক্ষার পথও বন্ধ হইল! সব চেয়ে দুঃখ অকারণ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইলাম। এইরূপ মানসিক দুঃখে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

সে কালের যুবকগণ এইরূপ ধর্ম্মভীরু এবং এইরূপ সাদাসিধে প্রকৃতির ছিল। কিন্তু একালে এই শ্রেণীর যুবক নিরেট বোকার মধ্যে গণ্য।

চাঁদ দিবসে ঠাকুর মহাশয়ের চাষ-আবাদের কার্য্য করিত, রাত্রিতে তাঁহার নিকটে পারসী শিখিত। সহৃদয় ঠাকুর মহাশয় ভৃত্যকে বিদ্যাদানে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

ঠাকুর মহাশয় চাঁদের চিন্তাযুক্ত মলিন বদন দেখিয়া পুনরায় কহিলেন,—“চাঁদ, তুমি আমার কথায় দুঃখিত হইয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে ?”

চাঁদ সাহসে ভর করিয়া ধীর অথচ কাতরকণ্ঠে কহিল,—“আপনি আমার আশ্রয়দাতা মনিব, এতকাল পায়ে রাখিয়া এখন কি নিমিত্ত পায়ে ঠেলিতেছেন ?”

চাঁদের হৃদয় যে তারার কথোপকথনসূত্রে অমূলক আশঙ্কায় অস্থির রহিয়াছে, ঠাকুর মহাশয় ঘুণাক্ষরেও তাহা অবগত নহেন। তিনি একটু বিস্মিত হইয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—“তুমি আমার কথায় কি মনে করিয়াছ চাঁদ ?”

চাঁদ। আপনি কোন অপরাধ পাইয়া আমাকে চরণছাড়া করিতেছেন।

ঠাকুর মহাশয় ভৃত্যের মন বুঝিবার জন্য বিদ্রূপের ভাণে কহিলেন—"হাঁ, তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ।" চাঁদের অন্তরাত্মা তখন সভয়ে কাঁপিয়া, তাহার মুখমণ্ডলকে আক্রমণ করিল। এই সময় তাহাকে ফাঁসীকাষ্ঠের অপরাধীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কারণ, সে ভাবিতেছিল, গত কল্যকার অপমানের কথা নিশ্চয়ই তারা তাহার পিতার নিকটে বলিয়াছে। এই সময় ঠাকুর মহাশয় আবার কহিলেন,—"তুমি দশকলসী সোনার টাকা পাইয়া এক কলসী মাত্র আমাকে দিয়া আর নয় কলসী কোথায় লুকাইয়াছ?" বধ্যভূমিতে নীয়মান্ ব্যক্তি যখন বুঝিতে পারে, সে বহুপাপের আসামী সাব্যস্ত হইয়াছে, বাঁচিবার আর আশা নাই; তখন সে অবলীলায় নিঃসঙ্কোচে নিজের বক্তব্য খুলিয়া বলিতে আর দ্বিধা বোধ করে না। সেইরূপ চাঁদ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার উপর অকারণ গুরুতর দোষ আরোপিত হইয়াছে, তখন সে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম ও প্রবঞ্চক সাব্যস্ত হইতেছি। আপনি সর্দ্দার, আমি তাবেদার, আপনার নিকটে আমার অপরাধ পদে পদে। কিন্তু আপনি আমাকে যাহাই ভাবুন, আমি এক কলসী মাত্র টাকা ক্ষেতে খুঁড়িয়া পাইয়াছি এবং তাহা আপনার ঘরে আনিয়া দিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আর বলিবার কিছুই নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, মুসলমান সন্তানের নিকট পার্থিব সম্পদ্ অতি তুচ্ছ। আমি মুসলমানের সন্তান, কোরাণ আমার ধর্ম্মগ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদ

আমাদের পথপ্রদর্শক। তিনি বলিয়াছেন, সয়তানের প্রলোভনে পড়িলে, মুসলমান সব রকম দুষ্কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু খোদা-তালার শরিফ স্বীকার, মাতা-পিতার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার ও মিথ্যা কথা বলা—এই তিন রকম মহাপাপ করিতে পারে না।” এই সকল কথা বলিবার সময় চাঁদ স্বকীয় ভৃত্যভাব ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার অনিন্দ্য মনোহর মুখমণ্ডল অলৌকিক পুণ্যতেজে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুর মহাশয় সামান্য ভৃত্যের হৃদয়ের বল ও ধর্ম্মের তেজ দেখিয়া পুলকিত-অন্তরে প্রীতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“সাধু! সাধু! বাবা, তুমিই প্রকৃত মুসলমান সন্তান। স্বর্ণমুদ্রার সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক। আমি তোমার মন বুঝিবার জন্যই নয় কলসীর ভাণ করিয়াছি মাত্র। যাহা হউক বৎস, অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয় হইলে। তোমার গুণের পুরস্কার, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর কি দিব? তুমি আজ হইতে দাসত্ব মুক্ত হইলে। স্বর্ণমুদ্রা যাহা পাইয়াছ, তদ্দ্বারা বিবাহ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ কর।”

মৃত্তিকায় নিহিত গুপ্তধন রাজার প্রাপ্য হইলেও উদারমতি ধর্ম্মভীরু পাঠান বাদশাহগণ উহা গ্রহণ করিতেন না। ঠাকুর মহাশয় ইহা জানিতেন।

চাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের কথার উত্তরে কহিল,—“কর্ত্তা, আমি আপনার বেতনভোগী চাকর। আপনার দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জমির মধ্যে সোণার কলসী পাইয়াছি, সুতরাং তাহা আপনারই ন্যায্য

প্রাপ্য। যাহা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য তাহা আমি কিছুতেই গ্রহণ করিব না।” ঠিক এই সময়ে দেবমন্দিরমধ্যে চাঁদের প্রেমে আত্মহারা, চাঁদগুণমুগ্ধা, চাঁদগতপ্রাণা তারার হস্ত হইতে অজ্ঞাতসারে পূজার ফুলের সাজী খসিয়া পড়িল। সে জড়বিগ্রহের সম্মুখে দাসত্বমুক্ত ভৃত্যকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া লইল। এ সময় অদূর দণ্ডকারণ্যে কতিপয় কোকিল সমস্বরে উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রকৃতির অনুজ্ঞায়ই যেন চাঁদের সহিত তারার মানসিক বিবাহ এইরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল।

চাঁদ ঠাকুর মহাশয়কে আরও কহিল—“কর্ত্তা, আপনার সাংসারিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল নহে। দিদিমণির বিবাহে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইবে। আপনি এই সোণার টাকাগুলি খরচ করিয়া দিদিমণিকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করুন।” তারা শুনিয়া মনে মনে কহিল,—‘চাঁদ, প্রাণেশ্বর, ও কি কহিতেছ? তোমার দিদিমণি যে আজ হইতে তোমারই হইল।’ এই সময় চাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া তারা বিলোল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতেছে।

চাঁদের সমস্ত সন্দেহ—ভয় তখন দূরীভূত হইল। সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ঠাকুর মহাশয় সদাশয় ভৃত্যের অলৌকিক আত্মত্যাগে মুগ্ধ হইয়া তৎসংবাদ গৃহিণীকে জ্ঞাপন করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাটের গুণ।

পরদিন অপরাহ্নে ঠাকুর মহাশয় বিগ্রহ-মন্দিরের অলিন্দে উপবেশন করিয়া পরিজনদিগকে বেদ পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। এই সময় একজন সুন্দরকান্তি যুবক আসিয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণে পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। যুবকের করে হেমযষ্টি, করাঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়ক, পরিধানে গ্রীষ্মোপযোগী মূল্যবান্ ধুতি, দেহে নয়নরঞ্জন স্বর্ণখচিত ফতুয়া;—যুবকের উজ্জ্বল দেহবর্ণ তন্মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার চরণে দিল্লীর জরীদার নাগরা জুতা। ঠাকুর মহাশয় যুবককে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“রাজপুত্র, এত কেন? সম্ভাষণ বা নমস্কারাদি করিলেই যথেষ্ট!” যুবক ইতঃপূর্ব্বে আর কখন ঠাকুর মহাশয়কে এমন ভক্তির সহিত প্রণাম করেন নাই। তারা পিতার নিকটে বসিয়া বেদ শুনিতেছিল। যুবককে দেখিবামাত্র উঠিয়া গেল। মহামায়া প্রমুখ অন্যান্য মেয়েরা ক্রমে মণ্ডপগৃহ ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর মহাশয় যুবককে সাদরে সম্মুখে বসিতে দিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। যুবক সবিনয়ে শুভ জ্ঞাপন করিয়া

ঠাকুর মহাশয়ের প্রবাসে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। ঠাকুর মহাশয় গুরুগৃহে মিহির-পূজার কথা উল্লেখ করিয়া বিলম্বের কারণ প্রদর্শন করিলেন।

যুবক। বাবার মুখে শুনিয়াছি আপনার গুরুদেবের ন্যায় জ্যোতির্ব্বিদ্ ভারতবর্ষে আর নাই ?

ঠা। তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তিনি অগাধ শাস্ত্রবিশারদ গণক।

এই সময় কন্যার রাজ্যেশ্বরী হওয়ার কথাটা ঠাকুর মহাশয়ের মনে পড়িয়া গেল। আবার যুবকের অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণেও তাঁহার অন্তরে ভাবান্তর জন্মিতেছিল। তিনি কি যেন মনে করিয়া সহসা কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"মা তারা, রাজপুত্রের জন্য কয়েকটি পান লইয়া আইস।" অদেশ শ্রবণে যুবকের আকর্ণমূল মুখমণ্ডলে প্রেমযুক্ত হর্ষের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। প্রবীণ ঠাকুর মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। মহামায়া পূর্ব্বরাত্রিতে কন্যার প্রতি রাজপুত্রের যে অনুরাগের কথা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইল। পিতার আদেশ কন্যা কখন লঙ্ঘন করে নাই ; আজও লঙ্ঘন করিতে পারিল না। অল্পক্ষণ মধ্যে একটি মনোরম তাম্বুলকরঙ্কে তাম্বুল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তারার দর্শনে রাজপুত্রের কমনীয় বদনমণ্ডলে অনুরাগের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল ; ঠাকুর মহাশয় ইহাও নিরীক্ষণ করিলেন।

অতঃপর যুবক দিল্লীর কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"ঠাকুর খুড়ো, আপনি ত রাজদরবারে যাতায়াত করেন। বাদশার সহিত আপনার যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে। আচ্ছা, তাঁহার মতি গতি কিরূপ ?" এই সময় ঠাকুর মহাশয় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, যুবকের কথা শুনিয়া কহিলেন,—"বাদশার স্বভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আমি যতদূর জানি বাদশা মহম্মদ তোগলকের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত সম্রাট্ প্রায় দেখা যায় না। তিনি একাধারে সাহসী সেনাপতি, উৎকৃষ্ট বক্তা, অসামান্য শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, উত্তম কবি এবং অনন্যসাধারণ বিদ্যানুরাগী।"

যুবক। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিলাস-ব্যসনাসক্ত, নিষ্ঠুর ও আড়ম্বরপ্রিয় বাদশাও নাকি আর নাই।

ঠা। আপনি ছেলে মানুষ, এখন পর্য্যন্তও সংসারের অবস্থা ভালরূপ বুঝিয়া উঠেন নাই। সংসারের সব জিনিসেরই ভিতর বাহির দুইটা দিক্ আছে, কিন্তু আমরা সকলেই অপূর্ণ ও অল্পদর্শী; তাই কেবল বাহিরের দিক্‌টা দেখিয়াই যা-তা বলিয়া বসি। বস্তুতঃ যাঁহারা সম্রাটের প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত নহেন, তাঁহারাই তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল বাহিরের অবস্থা দেখিয়া একজনের চরিত্রের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য নহে।

যুবক। আপনি কি বলিতে চাহেন তাঁহার দুরন্ত স্বভাবের কথা যে শুনিতে পাই, তাহা মিথ্যা ?

ঠা। অনেকাংশে তাহাই বটে। বর্ত্তমানে বাদশাহের সভায়

ইবন্‌বতুতা ও সাহাবুদ্দিন নামে পৃথিবী-বিখ্যাত দুইজন নিরপেক্ষ-চরিত্র পর্য্যটক অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন—বাদশাহ ধর্ম্মের সমুদয় নিয়ম প্রতিপালনে ও ইন্দ্রিয়দমনে তৎপর। কোরাণ ও আবুহানিফার শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ। ঈশ্বরোপাসনায় তিনি পরম নিষ্ঠাবান্। তিনি সুরাপায়ী ও ব্যভিচারীকে কঠোর দণ্ড প্রদান করেন। এই নিমিত্ত ঐ দুই গুরুতর দোষ ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। বাদশাহ যেমন ন্যায়পর, তেমনি বিনয়ী। বদান্যতা ও ধর্ম্মশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাহার পর ইবন্‌বতুতা আমাকে কহিলেন—বাদশাহ আপনাদের সম্বন্ধেও ত বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। আমি কহিলাম,—কোন্ বিষয়ের অনুগ্রহের কথা কহিতেছেন? তদুত্তরে তিনি কহিলেন—আমি কিছুদিন বাদশাহের প্রধান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সরকারী কাগজপত্রে দেখিয়াছি, পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহগণ সমস্ত হিন্দুর নিকট হইতে "জিজিয়া" কর আদায় করিতেন। কিন্তু ইনি ত ব্রাহ্মণজাতির জিজিয়া কর রেহাই দিয়াছেন। আমি কহিলাম—বাদশাহের ইহা বিশেষ অনুগ্রহ সন্দেহ নাই। আমিও বিশেষরূপে জানি তিনি ভোগ-বিলাসে অনাসক্ত। তবে যে তাঁহাকে রাজকার্য্যের নিমিত্ত বাহিরে দেখা যায় না, তাহার অন্য কারণ আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার ন্যায় বিদ্যানুরাগী বাদশা প্রায় দেখা যায় না। তিনি অধিকাংশ সময় তাঁহার পরম সাধের কোতবখানায় কেতাব পাঠে অতিবাহিত

করেন। যতবার তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে, প্রত্যেক বারই তাঁহাকে কোতবখানায় দেখিয়াছি। তিনি রাজকার্য্যে অবস্থা বিশেষে খুবই নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন বটে, কিন্তু সেটি কর্ত্তব্যের কঠোর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া করিয়া থাকেন। এ কথা ঠিক, তিনি খুব আড়ম্বরপ্রিয়। তবে বিপুল ঐশ্বর্য্যের খনি সৌন্দর্য্যের আধার ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বিশাল ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাটের পক্ষে সে আড়ম্বর অসম্ভব নহে।

যুবক। আপনি যাহাই বলুন, অনেকে তাঁহাকে ঘোর অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও দূরাকাঙ্ক্ষ সম্রাট্ বলিয়া থাকে।

ঠা। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার প্রাণরক্ষায় যাঁহার কোষাগার ও শস্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত থাকে, তিনি যদি প্রজাপীড়ক, তবে প্রজারঞ্জক কাহাকে বলা যায়? তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার কোন কার্য্য আমরা এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

যু। সম্রাট্ পারস্যবিজয় ও চীন আক্রমণ ইচ্ছা করিয়াছেন।

ঠা। সে ত পৌরুষশালী রাজার কার্য্যই বটে।

যু। তাহাতে প্রজা লোকের দুঃখ অনিবার্য্য। আরও শুনিতেছি সমস্ত সামন্তকে যুদ্ধের জন্য সৈন্য দিতে হইবে। প্রত্যেকের নিকট বাকী রাজকর নিঃশেষে আদায় হইবে।

ঠা। আপনাদের দেয় কর কি বাকী পড়িয়াছে?

যু। হাঁ; অনেক বাকী!

ঠা। আপনাদের বার্ষিক দেয় কর কত?

যু। তিন লক্ষ টাকা।

ঠা। কত বাকী পড়িয়াছে ?

যু। বাবার সময়ের ৫ লক্ষ, আমার সময়ের ২ লক্ষ—মোট ৭ লক্ষ টাকা বাকী।

ঠাকুর মহাশয় এতক্ষণে বুঝিলেন যুবকের হৃদয়ের ক্ষত কোথায় ?

ঠা। তাহা হইলে দুই বৎসরের উপর খেরাজ বাকী পড়িয়াছে। এত রাজকর বাকী রাখিয়া অব্যাহত প্রভুত্বে রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি বলেন বাদশা দুরাকাঙ্ক্ষ প্রজাপীড়ক ? আচ্ছা, এই বাকী খাজনার জন্য কি আপনার নিকট তলব তাগাদা আসে নাই ?

যু। অনেকবার আসিয়াছে, কিন্তু আমি বাবার মত একবার দিল্লীতে খাঁ দেওয়ানের সহিত উপায়ন লইয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তারপর এ পর্য্যন্ত আর তাগাদা আসে নাই।

ঠা। উপায়নবলে রাজকর বন্ধ রাখা মহা পাপ। পরন্তু পাপ কখন অপ্রকাশিত থাকে না। এত খেরাজ বাকী—ইহা বাদশার কর্ণগোচর হইলে আপনার মহা বিপদ্ উপস্থিত হইবে। খেরাজ বাকী রাখা আর রাজদ্রোহিতা, বাদশা একই মনে করেন। হস্তিপদতলে নিক্ষেপ বা মস্তকচ্ছেদন করিয়া তিনি রাজদ্রোহীর শাস্তি বিধান করেন।

ঠাকুর মহাশয়ের কথায় যুবক শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বিনীতভাবে জড়িত কণ্ঠে ঠাকুর

মহাশয়কে কহিলেন,—"বাদশা আপনাকে ভালবাসেন। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

ঠা। বাদশা আমাকে ভালবাসেন সত্য। কিন্তু আপনার অপরাধ গুরুতর। অবশ্য বুঝাইয়া দুই কথা বলিতে পারিলে, গুরুতর অপরাধীকেও তিনি ক্ষমা করিয়া থাকেন। আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু কতদূর কি করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

যুবক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া সোৎসাহে কহিলেন,—"ভগবান্ না করুন, বাকী খেরাজের নিমিত্ত বাদশাহের কোপানলে পতিত হইলে আপনি আমাকে রক্ষা করিবেন কিনা বলুন।"

ঠা। মহারাজ, স্থির হউন। আপনাকে রক্ষা করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আপনিও এখন হইতে বাকী খেরাজ শোধের সত্বর চেষ্টা দেখিবেন।

যুবক ঠাকুর মহাশয়ের স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া কৃচ্ছ্র-শ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং এই সময় একবার দেব-মন্দিরের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলেন—কিন্তু তাঁহার এ দৃষ্টি প্রেমলুব্ধ নহে; ব্রীড়াযুক্ত।

যুবক কিয়ৎক্ষণ অধোদৃষ্টিতে কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা উত্থিত হইয়া ঠাকুর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশায় ছাই।

পথে যাইতে যাইতে যুবক চিন্তা করিতে লাগিলেন,—সাত লাখ টাকা দিতে গেলে কোষাগার যে একেবারে শূন্য হইয়া পড়িবে। একমাত্র এই টাকার উপরই মান সম্ভ্রম ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। খেরাজের তাগাদা দুইবার হইয়া গিয়াছে, তৃতীয় বার আসিলে উহা না দিয়া আর নিস্তার নাই। ইহার এখন উপায় কি? চিন্তার সহিত যুবকের মুখ জ্যোতিঃ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, ঠাকুর মহাশয়কে শ্বশুর করিয়া লইতে পারিলে আমার সব কূল বজায় থাকিবে। তখন তিনি জামাতাজ্ঞানে দিল্লীর অত্যাচার হইতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। রাজভাণ্ডার খালি করিয়া দিল্লীতে খেরাজ পাঠাইতে বলিবেন না। প্রত্যুত তারারত্ন লাভে আমার চির আশা ফলবতী হইবে।

যুবক বাড়ীতে আসিয়া জনৈক বয়স্যযোগে বৃদ্ধ দেওয়ান ভট্টনারায়ণ বর্ম্মাকে স্বীয় মনোভাব জানাইলেন। দেওয়ান মহাশয়, সে কথা যুবকের মাতাকে জানাইলেন। গোত্রবিধানে

বিবাহের বাধা না থাকিলেও, গঙ্গারাম ঠাকুর দরিদ্র বলিয়া মাতা প্রথমে বিবাহে নানারূপ আপত্তি করিলেন, কিন্তু শেষে পুত্রের বিশেষ আগ্রহ জানিয়া ও দেওয়ানের নানারূপ যুক্তিতর্কে বুঝ মানিয়া সম্মত হইলেন।

একদিন দেশবিখ্যাত ঘটক প্রজাপতি শর্ম্মা, ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া দর্শন দিলেন। ঘটক মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশতের উপর। দেহের বর্ণে সামুদ্রিক জলজন্তু শিশুমারের লাবণ্য ফলিত এবং উদরের পরিধি শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফ সদ্যোনির্ম্মুক্ত।

মুণ্ডিত মস্তকে কাল ফিতার মত একটি শিখা দোদুল্যমান। ভুরুদ্বয় ষড়াননের ভুরুর ন্যায় সুবঙ্কিম, কিন্তু এতাধিক স্থূল ও দৃঢ় যে উপড়াইয়া লইলে অলঙ্কার মার্জ্জনের কার্য্য করা চলে। অর্ণবজাত ঝিনুকের গহ্বরপৃষ্ঠে শিলীমুখ অধিষ্ঠিত হইলে যেমনটি দেখায়, ঘটক মহাশয়ের অভ্রস্বচ্ছ অক্ষিগোলকপার্শ্ব-তার তদ্রূপ শোভাসম্পন্ন ও আকর্ণ-বিস্তৃত। নাসিকা কাকাতুয়া-দ্বিজের নাসিকাবৎ উন্নত ও বাঁকান। দশনরাজি সুপ্রশস্ত ও অতীব স্বচ্ছ বটে, কিন্তু মালিকের একান্ত অবাধ্য। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া পড়ে। ঘটক মহাশয়ের পরিধানে গেরুয়া বসন, গায়ে নামাবলী, গলে ধুস্তূরের মালা, করে জপের ঝুলি।

ঘটক মহাশয়ের চেহারা যেরূপই হউক না কেন, তিনি একান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ও মহানুভব ব্যক্তি। সচরাচর ঘটকেরা

যেরূপ অর্থপিশাচ হয়, রজত মুদ্রার লোভে যেরূপ ন্যায়ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অঘটন ঘটাইয়া থাকে, ইনি সে প্রকৃতির লোক নহেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ন্যায়তঃ সামান্য স্বার্থেই সন্তুষ্ট। এ নিমিত্ত দেশের লোক সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকে। স্পষ্টবাদিতা যদি দোষ হয় তবে তিনি সেই দোষে দোষী বটেন। সত্য কথা বলিতে তিনি ছোট বড় বলিয়া কাহারও মুখের দিকে চাহেন না এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য এক রাশি মিথ্যা কথার সৃষ্টি করিতে জানেন না।

ঘটক মহাশয় হাস্যমুখে সোজাসুজি ঠাকুর মহাশয়ের মণ্ডপ-অলিন্দে যাইয়া উপবেশন করিলেন। উভয়ের পূর্ব্বাবধি আলাপ পরিচয় ছিল। ঘটক মহাশয় বয়সে বড়, তাই ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"বড় ভাগ্যের কথা, এ যে গরীবের বাড়ী হাতীর পারা!"

ঘটক। ভায়া, হাতীর পারা নয়, মাহুতের পারা! হাতীর পদক্ষেপ-জ্ঞাপনমানসে আসিয়াছি।

ঠাকুর মহাশয় বিস্মিতভাবে ঘটক মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঘটক। ভায়া হে, আমি মহারাজ অজয়রামের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি।

গুরুদেবের গণনা, স্ত্রীর স্বপ্নদর্শন, অন্যান্য সুলক্ষণ কথন প্রভৃতি সন্দেহাত্মক ভাবগুলি যাহা ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়-নদের অন্তস্তলে ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল, তৎসমুদায় যুগপৎ

নবভাবে ফুটিয়া উঠিল। তিনি আশার উচ্ছ্বাস বুকে চাপিয়া কহিলেন,—"কোথায় ?"

ঘটক। আর কোথায় ? ভাগ্যবান্ গঙ্গারামের ভবনে।

ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয় লাভ বা দরিদ্রের স্বর্ণলাভ যাদৃশ সুখকর, প্রস্তাবটি ঠাকুর মহাশয়ের পক্ষে ততোধিক সুখের ও আশাপ্রদ। তিনি শুনিয়া হর্ষাতিশয্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ঘটক। পাত্রপক্ষের সকলেই তোমার কন্যা দেখিয়াছেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে এই কার্য্য পছন্দ করিয়াছেন। কেবল আদান প্রদান ও পত্রকরণ উপলক্ষে আমি নিমিত্তমাত্র হইয়া আসিয়াছি। এখন তুমি সম্মত হইলে শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে।

ঠা। আমার আবার সম্মতি কি ? আপনাদিগের অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে কৃতার্থ হইতেছি।

ঘটক। পাত্র চলিয়া আসিয়া বিবাহ করিবে। তন্নিমিত্ত তোমাকে নগদ তিন হাজার টাকা দেওয়া হইবে। তোমার ভাবী বেহানের ইহাই অভিপ্রায়।

ঠাকুর। তথাস্তু।

ঘটক মহাশয় "প্রজাপতয়ে নমঃ" বলিয়া সোৎসাহে গাত্রোত্থান করিলেন।

অতঃপর শুভদিন শুভক্ষণ দেখিয়া বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। দেশবিখ্যাত মহারাজ অজয়রামের একমাত্র পুত্রের বিবাহ। সুতরাং বহ্বাড়ম্বরে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাজ রঘুরাম তারার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া অমরাবতীতে চলিলেন—স্বর্ণাস্তরণ-শোভিত গজ বাজী খট্বাঙ্গ-যানে অগণিত বরযাত্রী বরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ক্রমে তাহাদিগের বিপুল সমাগমে ঠাকুর মহাশয়ের বাসভবন পূর্ণ হইতে লাগিল। একদিকে বারণের বৃংহণে,. অশ্বের হ্রেষারবে, বন্দুকের গুড়ুম্ গুড়ুম্ ধ্বনিতে, অসির প্রভা বিকাশে প্রশান্ত অমরাবতী টলায়মান হইতে লাগিল; অন্যদিকে শ্রবণসুখকর বিবিধ বাদ্যরবের ঐকতানে সেই টলায়মান পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঠাকুর মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় বিপুল সমারোহে বিবাহ-সভা সজ্জিত ও রচিত হইয়াছিল। পাত্র সহযাত্রিগণ সহ সভাসীন হইলেন। শুভলগ্নে মন্ত্রপাঠনার নিমিত্ত পুরোহিত সভায় উপস্থিত হইলেন। বৈবাহিক আনন্দোচ্ছ্বাসে বরণ-সভা দেব-সভার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। লগ্ন আসন্ন দেখিয়া পুরোহিতের আদেশে ঠাকুর মহাশয় কন্যা আনিতে অন্তঃপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় তিনজন মুসলমান মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতে করিতে সেই সভায় সমাগত হইলেন। হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে গৃহের যেরূপ অবস্থা হয়, হর্ষোদ্ভাসিত বিবাহ-সভার তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইল। সকলেই বিস্মিত নেত্রে সেই লোকত্রয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সদাশয় ঠাকুর মহাশয় কহিলেন—"বাবা, তোমরা কে? এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর খোদাবক্স মোল্লা খাজনার দায়ে মহা-

রাজের হাজত-গৃহে পাঁচদিন পাথরচাপায় আবদ্ধ থাকিয়া অদ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইয়া কবর দেওয়ার জন্য মহারাজের হুকুম লইতে আসিয়াছি।"

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে ওদুটি কে?"

বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার সেই মৃত ভ্রাতার পুত্রদ্বয়।

দয়াশীল ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, তিনি স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বিশাল নয়নযুগল ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে রঘুরামকে কহিলেন, হা! অর্ব্বচীন যুবক, তুমিই বল বাদশা মোহম্মদ তোগলক প্রজাপীড়ক! তুমিই বল তিনি ঘোর অত্যাচারী!

খোদাবক্সের মৃত্যুসংবাদ রঘুরামের কর্ণগোচর হইল। তিনি আদেশ করিলেন,—"আমার তহশীলদারের মধ্যে খোদাবক্স বেটা ভয়ানক দুষ্ট ছিল, পাঁচ সাত্ বৎসরের তিন চারি হাজার টাকা বাকী খেরাজ টাল-বাহানা করিয়া দেয় নাই, সুতরাং ইহাকে শৃগাল শকুনের মুখে ফেলিয়া দিতে হইবে, অথবা আগুন দিয়া জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে।"

আদেশ শ্রবণ করিয়া খোদাবক্স-সাহেবের ভ্রাতার মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি জোড়হাতে কহিলেন,—"দোহাই মহারাজ, এমন নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। আমার ভ্রাতা প্রত্যহ কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেন। পাঁচ ওক্তে নামাজ পড়িতেন। রোজা রাখিতেন।" বড়ছেলেটি "হায়, কি ভয়ানক আদেশ!" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ছোট ছেলেটি "আমার বাবাজানকে কবর্

দিতে দেন” বলিয়া বরণ-সভার মধ্যে গিয়া রঘুরামের পা জড়াইয়া ধরিল। এই অমঙ্গল ঘটনায় ঠাকুর মহাশয় একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন,—“কুমার বাহাদুর, আপনি এ কিরূপ আদেশ করিতেছেন ? এখনই এই আদেশের প্রত্যাহার করুন ; নচেৎ আপনার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আপনি যে নিজ মস্তকে নিজে কুঠারাঘাত করিতেছেন ? এ আদেশ বাদশার কর্ণে পৌঁছিলে আপনি ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইবেন।”

সভাস্থিত সহৃদয় বরযাত্রিগণও এই ঘৃণিত আদেশের প্রতিবাদ করিলেন। তখন ভয় পাইয়া রঘুরাম পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার করিয়া খোদাবক্সকে লইয়া যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। খোদাবক্সের ভ্রাতা ও পুত্রদ্বয় চলিয়া গেলেম।

ঠাকুর মহাশয় শুভ বিবাহের পূর্ব্বলক্ষণ এমন অশুভ ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—যদি আগে জানিতাম তাহা হইলে এমন নিষ্ঠুর বরে কখনই কন্যাদানে সম্মত হইতাম না। কি করি বাগ্দান করিয়াছি, এখন ত আর উপায় নাই ? এই সময় পুরোহিত, ঠাকুর মহাশয়কে কহিলেন,—“লগ্ন অতীত প্রায়। কন্যা সভায় আনয়ন করুন।”

ঠাকুর মহাশয় অনুতাপের বোঝা বুকে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই শুনিতে পাইলেন, মেয়েমহলে সকলেই বলিতেছে—মেয়ে কোথায় ? গৃহিণী মহামায়া বলিতেছেন—সর্ব্বনাশ ! আমার তারা কোথায় ? ঠাকুর মহাশয় গৃহিণীকে কহিলেন,—“ওগো, তুমি কি করিতেছ ? লগ্ন

অতীত প্রায়, সত্বর মেয়ে প্রস্তুত করিয়া দাও।" উপস্থিত বর্ষীয়সী জনৈক রমণী উত্তর করিলেন—"মেয়েই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তার আবার লগ্ন!" ঠাকুর মহাশয় শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, শেষে ভাবিতে লাগিলেন—মেয়ে আমার প্রত্যক্ষদয়ারূপিণী। বরের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা—নির্দ্দয়তা জানিতে পারিয়াই বঝি কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে; তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ যাবৎ মেয়ে পাওয়া যাইতেছে না?" কেহ ঠিক উত্তর করিতে পারিল না।

ঠাকুর মহাশয় দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্, তুমি কি উদ্দেশ্যে যে কি ঘটাইতেছ, তাহা তুমিই জান।" বরণ-সভায় সংবাদ পৌঁছিল—পাত্রী নিরুদ্দেশ! কিন্তু কি নিমিত্ত কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। বরযাত্রিমণ্ডলী একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। সংশয়, অপ্রত্যয় ও অভাবিত রহস্য অল্প সময় মধ্যে বরণ-সভায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিল। স্থানে স্থানে গুপ্ত বৈঠক বসিল। কোন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হইল, কন্যার পিতা বরের নিকট বেশী টাকা আদায়ের জন্য কন্যা গোপন করিয়াছেন। কোন বৈঠকের লোক বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর মহাশয়ের দয়ার শরীর, বরের অত্যাচারে খোদাবক্সের প্রাণবিয়োগ ঘটায় হয়ত এমন বরের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না বলিয়া নিরুদ্দেশের ভাণ করিতেছেন। আর আর যাহারা চরিত্রহীন নব্যযুবক তাহারা মীমাংসা করিল, বয়স্থা কন্যা, চরিত্র মন্দ হইয়া থাকিবে। অন্য উপায়ান্তর নাই

ভাবিয়া গুপ্ত প্রণয়ীর সহিত গা-ঢাকা দিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, —খুবছুরত মেয়ে, পরীতে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। মেয়ে-মহলেও ইত্যাকার অনেক জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। ব্রজের গোপী পদ্মা কি যেন ভাবিয়া এই সময় একবার চাঁদের খোঁজ করিল। যাইয়া দেখে সে বাহির-বাড়ীতে বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছে। তথায় পদ্মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"চাঁদ, তারার খবর জান ?" চাঁদ কহিল,—"না। তোমরা অন্দরে থাকিয়া জান না, আমি বাহির-বাড়ী হইতে কিরূপে জানিব ?" পদ্মা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল।

অতঃপর বরের বিশেষ আদেশে সূক্ষ্মভাবে কন্যার অনুসন্ধান চলিল। অসংখ্য লোক, পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী ঘর, উদ্যান উপবন, অরণ্য জলাশয় ছাইয়া ফেলিল। তাহারা প্রতি স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিন চারিবার করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও পাত্রীর সন্ধান হইল না। শেষে অমরাবতীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বের গৃহে গৃহে, বনে জঙ্গলে, নিভৃতকন্দরে অনুসন্ধান চলিল, কোথাও কন্যা পাওয়া গেল না। এদিকে মহামায়া তারা-হারা হইয়া আত্মহারা পাগলপারা হইয়া উঠিলেন। কন্যার অন্তর্ধানে প্রবীণ ঠাকুর মহাশয়ও 'হা ভগবন্ কি করিলে' বলিয়া একান্ত আত্মবিহ্বল ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সহৃদয় পুরুষ-পুরঙ্গনাগণ এই আকস্মিক বিপদে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসব-মুখরিত ভবন বিষাদের কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল।

বুভুক্ষিতজন স্বপ্নযোগে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আবার স্বপ্নভঙ্গে তাহার সে আনন্দ যেমন নিমিষে বিলুপ্ত হইয়া যায়, রঘুরামের তারালাভের আশা সেইরূপ নিষ্ফল হইল। তিনি, ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার কন্যার প্রতি নানারূপ সন্দেহ করিয়া, তিন দিন পর, হতাশ চিত্তে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে একটি বয়স্থা বালিকা কম্পিত পদসঞ্চারে ঠাকুর মহাশয়ের অন্তঃপুরস্থ অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ালোকপরিশূন্য নির্জ্জন নির্ব্বাত গৃহমঞ্চ-তলের সর্ষপ শস্যাদি যেমন পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, বালিকার দেহের বর্ণ সেইরূপ দেখাইতেছিল। শিবপ্রাপ্তি-সাধনায় উমার শরীর যেরূপ কৃশ হইয়াছিল, তদ্রূপ কোন কঠোর তপশ্চর্য্যায় বালিকার দেহ যেন অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াছে। সে প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া পতনোন্মুখ দেহের ভারে কম্পিত হইতেছিল, তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। মহামায়া মুহূর্ত্তকাল বালিকার দিকে চাহিয়া মা মা বলিয়া তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বালিকা মাতৃ-ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। শেষে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আপন মুখে অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিতে মাতার নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিল। মা তৎক্ষণাৎ কন্যাকে কিঞ্চিৎ পথ্য ও দুগ্ধ পান করাইলেন। কন্যা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। মহামায়া এইরূপে হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমানা হইলেন। বিবাহ-ভঙ্গজনিত ক্ষোভ ও জাতিপাতশঙ্কা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

অতঃপর একদিন পদ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এ চারিদিন কোথায় গা-ঢাকা দিয়াছিলে?" তারা পদ্মার কথায় কোন উত্তর করিল না।

পদ্মা। তুমি বিবাহের দিন পলাইয়া কর্ত্তার মুখে চূণকালি দিয়াছ। আমরা আশা করিয়াছিলাম রাজপুত্র জামাতা পাইব; তা তোমার দোষে আমাদের এতবড় আশা একেবারে বিফল হইল।

"রাজপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি তোমাদের জামাই হইয়াছেন"—এই বলিয়া তারা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পদ্মা তারার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"তুমি পাগল হইয়াছ? বিবাহ না হইতেই জামাই।"

তারা। আমার বিবাহ হইয়াছে?

পদ্মা। কাহার সহিত?

"সেই শ্রেষ্ট ব্যক্তির সহিত"—বলিয়াই তারা পুনরায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পদ্মা এইরূপ অকারণ হাস্য দেখিয়া বুঝিল, মেয়ে উন্মাদিনী হইয়াছে। আমরাও জানি এই সময় তারা অনেক বিষয়ে উন্মাদ ভাবই প্রকাশ করিয়াছিল। পদ্মা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। তারার মাতা পিতা মেয়ের অবস্থা জানিয়া মর্ম্মাহত ও চিন্তিত হইলেন।

অল্পদিন মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল,—গঙ্গু ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহের রাত্রিতে পরীতে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, তিন দিন পর আবার ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে এখন সন্ন্যাসিনী।

রঘুরাম তারার রূপে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার প্রাপ্তি সংবাদে যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং তাহার পলায়ন বা অন্তর্দ্ধান দোষাবহ মনে না করিয়া, পুনরায় তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তারা যে সন্ন্যাসিনী বা পাগলিনী হইয়াছে ইহা তিনি বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি রহস্য অবধারণ বাসনায় গুপ্তানুসন্ধানে ব্রতী হইলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

যথাসময়ে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন কোতবখানায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাদশাহ ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন—"অদ্য আপনাকে একটি স্বপ্নের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে, তাই ডাকিয়াছি।"

ঠা। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

বা। আমি পরশ্ব শেষরাত্রিতে প্রথমবার স্বপ্ন দেখিলাম, রাজ্যের প্রজালোক, স্ব স্ব সন্তানের পেটের নাড়ী বাহির করিয়া খাইতে উদ্যত হইয়াছে। দ্বিতীয় বার দেখিলাম, আমার মস্তকের উপর ঊর্দ্ধাকাশে ক্রমশঃ করালকৃষ্ণ মেঘমালার সঞ্চার হইতেছে এবং তন্মধ্য হইতে চিত্তবিগলিত করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। আবার দেখিলাম, আমার এই জাহানপান্না রাজপ্রাসাদসহ দিল্লীনগরী ডানা-ভাঙ্গা শকুনির ন্যায় স্থানান্তরে উড্ডয়নের প্রয়াস পাইতেছে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমি আর কখন দেখি নাই।

ঠাকুর মহাশয় কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অবস্থান করিয়া বিষাদগম্ভীরে কহিলেন,—"আপনি দুনিয়ার মালিক, ভবদীয় মহান্ হৃদয় সত্য কথার পক্ষপাতী; তাই বলিতে সাহসী হইতেছি, স্বপ্ন সাতিশয় অশুভকর। প্রথমটিতে রাজ্যে আশু দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টিতে দেশময় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তৃতীয়টিতে দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে। এবং সেই সূত্রে ভবদীয় রাজত্বের অবসান হইবে।"

যথাসময়ে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন কোতবখানায় বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাদশাহ ঠাকুর মহাশয়কে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন—"অদ্য আপনাকে একটি স্বপ্নের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইবে, তাই ডাকিয়াছি।"

ঠা। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

বা। আমি পরশ্ব শেষ রাত্রে তিনখানি স্বপ্ন দেখিলাম, রাজ্যের প্রজালোক, স্ব স্ব সন্তানের পেটের নাড়ী বাহির করিয়া খাইতে উদ্যত হইয়াছে। দ্বিতীয় বারে দেখিলাম, নীলাম্বু সমুদ্রের উপর ঊর্দ্ধাকাশে ক্রমশঃ করালকৃষ্ণ মেঘমালা ব্যাপ্ত হইতেছে এবং তন্মধ্য হইতে চিত্তবিদারিণী করুণ আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। আবার দেখিলাম, আমার এত সাধের রাজপ্রাসাদ সহ দিল্লী-নগরী ডানা ভাঙ্গা শকুনির ন্যায় স্থানান্তরে উড্ডয়নের প্রয়াস পাইতেছে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমি আর কখন দেখি নাই।

ঠাকুর মহাশয় কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অবস্থান করিয়া বিষাদগম্ভীরে কহিলেন,—"আপনি দুনিয়ার মালিক, ভবদীয় মহান্ হৃদয় সত্য কথার পক্ষপাতী; তাই বলিতে সাহসী হইতেছি, স্বপ্ন সাতিশয় অশুভকর। প্রথমটিতে রাজ্যে আশু দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টিতে দেশময় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইবে। তৃতীয়টিতে দিল্লী রাজধানী স্থানান্তরিত হইবে। এবং সেই সূত্রে ভবদীয় রাজত্বের অবসান হইবে।"

বাদশাহ যখন এই স্বপ্ন দর্শন করেন তখন তাঁহার রাজত্বের পূর্ণ উন্নতির কাল। রাজ্যলোলুপ উজির মালেকজাদ যে তলে তলে নিমকহারাম দুষ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত সম্রাটের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত গভীর ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। তাই সৌভাগ্য-গর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় ভীত বা প্রচলিত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—"রাজ্যের দুর্ভিক্ষ নিবারণের পথ আমি পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমার শস্যভাণ্ডারে গত পঁচিশ বৎসরের শস্য মজুত রহিয়াছে, দুর্ভিক্ষের সূচনায় তাহার দ্বার খুলিয়া দিলেই প্রজালোকের প্রাণ রক্ষা হইবে।" দ্বিতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বাদশা কহিলেন,—"বিদ্রোহবহ্নি দমনের যথোচিত উপায় করিতে পারিব।" তৃতীয় স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় কহিলেন,—"রাজধানী স্থানান্তরিত ও আমার রাজত্বের অবসান কবে হইবে এখন তাহাই বলুন।"

ঠা। দিন নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারিব না।

বা। তবে আর গণনার বাহাদুরী কি?

ঠা। পারিব না—ইহা অক্ষমার্থে বলি নাই। গুরুর কৃপায় বান্দা জাঁহাপনার মৃত্যুর দিনও গণনা করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল গুরুতর বিষয়ের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া বলায় গুরুর বিশেষ নিষেধ আছে।

বা। আচ্ছা, আমার মৃত্যুর ও রাজত্বের অবসান, বিলম্বে কি সত্বর ঘটিবে তাহাই বলুন।

ঠা। উভয় ঘটনাই বিলম্বে ঘটিবে।

বা। আমি পারস্য ও চীন বিজয়ে মানস করিয়াছি, সফলকাম হইব কি ?

ঠা। বিষয় গুরুতর, তিন দিন পরে গণিয়া বলিব।

এই বলিয়া ঠাকুর মহাশয় বাদশাহের অনুমতি লইয়া বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

তিন দিন পরে পুনরায় ঠাকুর মহাশয় বাদশাহের সন্নিহিত হইলে, বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গণনায় কি দেখিলেন ?"

ঠাকুর মহাশয় বাদশাহকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"অভিযানের অর্দ্ধপথে শবের পর্ব্বত দৃষ্ট হইল।"

বা। বুঝিলাম না।

ঠা। যতলোক যুদ্ধে যাইবে, গন্তব্য স্থানের অর্দ্ধপথে লেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

বা। বিনাযুদ্ধে ?

ঠা। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি যুদ্ধে ও অধিকাংশ বিনাযুদ্ধে।

বা। বিনাযুদ্ধে কেমন করিয়া মরিবে ?

ঠা। প্রাকৃতিক উৎপাতে।

বা। তাহা হইলে দিগ্বিজয়ে না যাওয়াই ভাল ?

ঠা। সার্ব্বভৌম ভারতেশ্বরের পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ।

সায়াহ্নে উজির মালেকজাদ দৈনন্দিন বিধানমত বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

বাদশাহ কহিলেন,—“উজিরবর, অভিযানের আয়োজনে বিরত হউন।”

উজির আশাভঙ্গ স্বরে কহিলেন,—“সাহানশাহ, গোলামের গোস্তাকী মাপ করিতে মরজি হয়। আয়োজনে বিরত হইব কেন?”

বা। জ্যোতির্ব্বিদ্ গঙ্গারাম ঠাকুর গণনা করিয়া দেখিয়াছেন—যত লোক যুদ্ধে যাইবে অর্দ্ধপথে সকলেই প্রাণ হারাইবে।

উজির। হুজুর, বান্দা অভয়দান প্রার্থনা করিতেছে।

বা। স্বচ্ছন্দে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন।

উজির। দুনিয়ার মালিক, আলেক জাণ্ডার, গজনবী গোরী, প্রভৃতি দিগ্বিজয়া মহাবীরগণ কেহই ত গণনা করিয়া বিদেশ বিজয় করেন নাই। সেরূপ করা তাঁহারা দুর্ব্বলতা মনে করিতেন। পুত্র-পৌত্রাদির শুভাশুভ নির্দ্ধারণে অনেকে গণনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু রাজকার্য্যে গণনা উপহাসের কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে ভবাদৃশ জনের ন্যায় জ্ঞানী ও বিদ্বান্ এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মহীপাল মহীতলে আর কে আছে? ভবদীয় বিদ্যাবত্তা ও পরাক্রম বিশ্ববিশ্রুত। সামান্য গণকের গণনায় যদি উপস্থিত অভিযানে বিরত হন, তাহা হইলে ভবজ্জনের বিশ্বব্যাপী নির্ম্মল যশশ্চন্দ্র চির মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে এবং আপনা হইতে অদীনবিক্রম বিশ্বজিৎ পাঠানকুলে চির কলঙ্ককালিমা অনুলিপ্ত হইবে।

মালেকজাদ এইরূপ বলিয়া কতকগুলি পত্র বাহির করিয়া

বাদশাহের সম্মুখে রাখিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"দুনিয়ার মালিক, এই দেখুন গোলামের বরাবর দেবগিরি, বদায়ুন, সিস্তান, অযোধ্যা, কনোজ, হানসী, মূলতান, তৈলঙ্গ, গুজরাট, মালব, কারা, দ্বারসমুদ্র প্রভৃতি প্রত্যেক প্রদেশ হইতে খত আসিয়াছে—'আমরা আহ্লাদের সহিত বাদশা নামদারের মহাভিযানের উদ্দেশ্যে অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতেছি।' এক লক্ষ্মণাবতীর হিন্দু শাসনকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"আমার বাকী খেরাজ ৮লক্ষ টাকা ও পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সত্বর রাজধানীতে উপস্থিত হইতেছি।' হুজুর, আমাদের সমস্ত প্রদেশ হইতে এইরূপ সৈন্য ও অর্থের সমাগম হইলে আমরা চীন পারস্য কেন, বিশ্ব বিজয়ে সমর্থ হইব। হুজুর, এমতাবস্থায় যদি এখন অভিযানে ক্ষান্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ জাঁহাপনাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইবে। ইহা অবধারিত কথা। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মহাভিযানে বিরত হওয়া ভবাদৃশ বিক্রমকেশরী সম্রাটের পক্ষে কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে।"

পাঠক! মালেকজাদের উল্লিখিত পত্রসমূহ জাল নহে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত যে তাঁহার গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মালেকজাদ বাদশাহের চলচিত্ততা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন—তাই পূর্ব্ব হইতেই ফন্দী করিয়া ঐ সকল পত্র সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা সঙ্গে

সঙ্গে রাখিতেন। অদ্য দৈবযোগে তদ্দ্বারা দুরভিসন্ধি সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

গঙ্গুঠাকুরের গণনার বীজ বাদশাহের অন্তর-ক্ষেত্রে যাহা পূর্ব্বাহ্নে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, উজিরের যুক্তি-অস্ত্রে এইরূপে তাহা সায়াহ্নে কর্ত্তিত হইল। বাদশাহ পূর্ব্বাদেশের প্রত্যাহার করিয়া উজিরকে পুনরায় অভিযানের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। সংসার-নাট্যগৃহে ইহারই নাম বাদশাই খেয়াল বা অভিনয়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাল্যদান।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে ;—সূর্য্য মধ্যগগন ত্যাগ করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় চাঁদ মাধ্যাহ্নিক আহার শেষ করিয়া বিশ্রামলাভ মানসে দণ্ডকারণ্যের এক বকুল-তলে উপবেশন করিয়া ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। অরণ্যের শীতল শ্যামলপত্রচুম্বিত সমীরণ, তলবাহী হইয়া তাহার গাত্রে ধীরে মধুরে সঞ্চালিত হইতেছে। মৃদুমন্দানিলস্পর্শে ফুলরাশি টুপ্ টাপ্ করিয়া বৃক্ষের তলায় পড়িতেছে। দুই চারিটি ফুল চাঁদের দেহেও পতিত হইয়াছে।

তারা চাঁদকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া ভাবিয়াছিল, এখন তাহার হৃদয়ের ব্যথা—মনের কথা প্রেমাস্পদের নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিবে; কিন্তু লজ্জার বিষম অন্তরায়ে তাহা পারিয়া উঠে নাই, সাধারণ ভাবে কথোপকথনেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। আবার রঘুরামের সহিত বিবাহের গণ্ডগোলের পর তাহার এই লজ্জা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ তারা যেন কি ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বকুলতলায় আসিয়া দেখিল, চাঁদ বিঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সে এই মাহেন্দ্র সুযোগে

অসঙ্কোচে অতৃপ্ত নয়নে চাঁদের চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এই অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইতে লাগিল, যেন কৈলাসের বিল্ববৃক্ষতলে স্বয়ং শিব শয়ান রহিয়াছেন, আর শিবগতপ্রাণা ভগবতী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মনোমোহন রূপ দর্শন করিতেছেন। বালিকা পলকহীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই রূপ সুধাপানে ক্রমশঃ বিভোর হইতেছে। পানেচ্ছা যেন আর মিটিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে চাঁদের দেহে বকুল ফুল পতিত দেখিয়া তারা ভাবিল—আজ স্বয়ংবর-বিবাহের পূর্ণতা বিধান করিব। সে কতকগুলি বকুলফুল লইয়া সুন্দর একছড়া মালা গাঁথিল। ইচ্ছা নিদ্রিত দয়িতের গলে মাল্য সম্প্রদান করিবে। তাই বালিকা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চাঁদের শিরোদেশে যাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এমন সময়ে কে যেন হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাজী চাপিয়া ধরিয়া, ফুলের মালা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সক্রোধে তাহাকে কহিল,—"পাপিয়সি, ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্কিনি! ভৃত্যের গলে বরমাল্য দান!" তারা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সভয় চীৎকারে চাঁদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে শশব্যস্তে উঠিয়া দেখিল, রঘুরাম তারার কেশগুচ্ছ ধরিয়া প্রহারে উদ্যত হইয়াছেন। মাল্যদান জন্য রঘুরাম যে তারার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন, চাঁদ তাহা জানিতে পারে নাই। সে ভাবিল, বিবাহের দিন তারা পলাইয়াছিল তজ্জন্য রঘুরাম তাহাকে প্রহারে উদ্যত হইয়াছেন; তাই সে কহিল,—"মহারাজ একি অন্যায় ব্যবহার?" বলিতেই রঘুরাম, "হাঁরে নিমকহারাম গোলাম!"

বলিয়া সক্রোধে সজোরে তাহার বক্ষে এক পদাঘাত করিলেন। দিল্লার সনাল নাগরা জরীর জুতা তাঁহার পায়ে ছিল। জুতার নালের আঘাতে চাঁদের বুকের চামড়া কাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। সে তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় রঘুরামের বাহুদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। রঘুরাম নিজ হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর চাঁদ স্বেচ্ছায় তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিল। নির্লজ্জ রঘুরাম পুনরায় অমিত রোষে চাঁদের বাহুদ্বয় আকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। চাঁদ তখন সাধ্যমত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পাঠক হয়ত ভাবিয়াছেন, তারা মুক্তিলাভ করিয়া ভয়ে বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ দেখুন, সে চাঁদের বিপদাশঙ্কায় আত্মরক্ষা ভুলিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া দয়াময়সন্নিধানে চাঁদের জয়লাভ প্রার্থনা করিতেছে।

রাজভোগপরিপুষ্ট রাজপুত্র রঘুরাম ভাবিয়াছিলেন, পরান্নে পালিত কৃষাণের দেহে আর কত বল? মাথায় আর কত বুদ্ধি? তাই তিনি অবজ্ঞাভরে চাঁদকে ভূমিতলে চিৎপাত করিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু যখন সহজে পারিয়া উঠিলেন না, তখন প্রাণপণ চেষ্টায় রত হইলেন। ঘর্ম্মধারায় তাঁহার দেহ আপ্লুত হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। এই সময় তিনি কি যেন ভাবিয়া একবার পার্শ্বে ফিরিয়া চাহিতেই তারার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। চাঁদ তৎক্ষণাৎ রঘুরামকে সশব্দে

চিৎপাত করিয়া ফেলিল এবং স্বকীয় দক্ষিণ জানুদ্বারা তাঁহার বক্ষঃ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—"মহারাজ এখন? বিনামা প্রহারে পাঠানের বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন, এখন? ঐ ত আপনার সেই বিনামা পার্শ্বে পড়িয়া আছে, উহা দিয়াই প্রতিশোধ লইতে পারি; কিন্তু আমি তাহা করিব না।" এই বলিয়া চাঁদ রঘুরামের হাত ধরিয়া ভূতল হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল এবং কহিল,—"নিমকহারাম গোলাম বলিয়া আর গালি দিবেন না। তারা আমার প্রভুকন্যা। তাহাকে অপমানিত করার অপরাধও ক্ষমা করিলাম।" রঘুরামের তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। তিনি ক্ষোভে অপমানে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ধীরে ধীরে দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—— :0: ——

চাঁদের লাঠিযুদ্ধ।

সেইদিন নিশীথে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীর অনতি দূরে দেবদারুতলে শতাধিক লাঠিয়াল সর্দ্দার সমবেত হইল। প্রত্যেকের হস্তে সুদৃঢ় বাঁশের লাঠি, অধিকাংশ লাঠিয়াল ভোজপুরী দেশওয়ালী। মুসলমান দুই চারি-জন মাত্র। চাঁদের মাথা কাটিয়া লইয়া যাইতে পারিলে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা এবং তারাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিতে পরিলে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া রঘুরাম ঐ সকল লাঠিয়াল পাঠাইয়াছেন।

লাঠিয়ালগণ লাঠিহস্তে ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এজগতে কুক্কুরের শ্রবণশক্তি যাদৃশ প্রখর, এমন আর কাহারও নহে। লাঠিয়ালগণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন সত্বেও তাহাদের পাদ-বিক্ষেপধ্বনি বাঘার কর্ণকে এড়াইতে পারিল না। বাঘা বাঘের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি ও গর্জ্জনে চাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রালু বিলাসী মার্জ্জার জাগিয়া কাপুরুষের ন্যায় গৃহমঞ্চের নিভৃত কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চাঁদ ভাবিল চোর আসিয়াছে। তাহার প্রিয়তম লাঠিত্রয়ের একখানি হাতে করিয়া নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে বাহির হইল। উঠানে পা দিতেই দেখিতে পাইল সম্মুখে শতাধিক লাঠিয়াল। চাঁদ

নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কে ?" সমস্বরে উত্তর হইল—"তোর যম !" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠির আঘাত করিল।

তৎকালে বিষ্ণুপুকুরের যমসের খাঁন সাহেব লাঠি খেলায় হিন্দুস্থানে অদ্বিতীয় সর্দ্দার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। চাঁদ তাঁহারই কাছে শিক্ষা-প্রাপ্ত। শিক্ষা শেষ হইলে খাঁন সাহেব চাঁদের মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৎস, এযাবৎ আমার শিষ্যগণের মধ্যে লাঠিবিদ্যায় একমাত্র তুমিই আমাকে অতিক্রম করিয়া গেলে। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অমরধামে চলিয়া যাইবে। তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার আমার কিছুই নাই। ধর আমার প্রিয়তম এই শিরস্ত্রাণ ও চৌশির ধারী তরবারিখানি তোমাকে দান করিলাম।" চাঁদ ওস্তাদের মহামূল্য দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য বোধ করিতে লাগিল।

চাঁদ এত দিন কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষার পরীক্ষাদানের সুযোগ পায় নায়। আজ তাহার মাহেন্দ্রযোগ; আজ সে পরীক্ষাদানের সুযোগের উল্লাসে উৎফুল্ল। আজ তাহার চিরাবরুদ্ধ শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রম প্রমুক্তভাবে গর্ব্বস্ফীত। আজ সে কায়মনোবাক্যে অদীনপরাক্রমশীল। সে হঠাৎ লাঠিয়ালগণের যমদণ্ডাঘাতে উত্তেজিত হইয়া আল্লাহো আকবর রবে ভীম গর্জ্জন করত লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তিন চারি হাত শূন্যে উত্থিত হইল। তাহার পর দৃঢ়পদে ভূমিতলে দাঁড়াইয়া দুই হস্তে দ্বিশত হস্তের দণ্ডাঘাত

প্রতিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া লঘুহস্তে চতুর্দ্দিকে লাঠি চালনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, বায়ুর সংঘর্ষণে তাহার লাঠির মুখে যেরূপ বন্ বন্ শন্ শন্ শব্দ উত্থিত হইয়া দিগন্ত শব্দায়মান করিয়া তুলিল, তদ্দর্শনে লাঠিয়ালগণ স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা চাঁদের শরীরে একটী আঘাতও করিতে সমর্থ হইল না। তাহাদের দৃঢ়হস্ত ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল। চাঁদ কখন চক্রাকারে, কখন সর্পাকারে, কখন অর্দ্ধবৃত্তাকারে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। দলপতির ইঙ্গিতে তখন লাঠিয়ালগণ ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। দলপতির উদ্দেশ্য— একক যুবক আর কতক্ষণ লাঠি চালনা করিবে? পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেই সমবেত লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিব। কিন্তু কালে তাহা হইল না, চাঁদ দেখিল। তাহাদের প্রথমাক্রমণ-বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তাই সে লাঠি চালনার মধ্যেই কৌশলক্রমে নিজ হস্ত ও দেহকে বিশ্রাম দিয়া লইতে লাগিল। লাঠি-বিদ্যায় চাঁদের চতুরতা ও বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া দলপতি মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং আর শৈথিল্য না করিয়া জয় মহারাজ রঘুরামকি জয়" বলিয়া "বা ঐ-ঝাঁক চাল" অবলম্বনে ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় ভীমবেগে সকলে যুগপৎ চাঁদের উপর পতিত হইল।

এইবার পূর্ণ প্রতাপে যুদ্ধারম্ভ হইল। চাঁদ এখন বুঝিতে

পারিল রঘুরাম হিংসাবশে এই কার্য্য করিয়াছেন। নীরব নিশীথে দূর গ্রামান্তরে গৃহদাহ আরম্ভ হইলে যেমন ঠাস ঠাস ফটাশ ফটাশ শব্দে বাঁশের গাঁইট ফুটিতে থাকে, উভয় পক্ষের লাঠির ঘাত প্রতিঘাতে তখন সেইরূপ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। শ্রাবণের ঘন-ধারাবৎ অবিশ্রান্ত নিপতিত লাঠি-বৃষ্টিতলে অবস্থান করিয়া চাঁদ এমন দৃঢ়মুষ্টিতে বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে লাঠিচালনা করিতে লাগিল যে, বিপক্ষের আঘাতিত লাঠি সব দিক্ হইতে প্রতিঘাত হইয়া উল্কার ন্যায় দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কোন লাঠি স্বদলভুক্ত লাঠিয়ালের মাথায় পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল, কোন লাঠি অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া অন্য লাঠিয়ালের নাক ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কাহারও বা ললাট ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। চাঁদের শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রম বায়ুসখা বহ্নির ন্যায় তৎসঙ্গে আরও তেজোদীপ্ত ও সৃষ্টিনাশী হইয়া উঠিল। এই সময় অঘোরলাল নামক জনৈক সর্দ্দারের লাঠির আঘাতে চাঁদের হাতের লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল। জয়দৃপ্ত চাঁদ হতাশচিত্তে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই আর এখানি নূতনলাঠি তাহাব সম্মুখে পতিত হইল। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই অঘোরলাল দেখিল—ঠাকুর মহাশয়ের মণ্ডপ-অলিন্দে যেন সাক্ষাৎ ভগবতীর আবির্ভাব হইয়া নিমেষে মিলাইয়া গেল। চাঁদ ত্রস্তহস্তে নূতন লাঠি লইয়া বিপক্ষদলনে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইল। এবার সে নূতন লাঠি দক্ষিণ হস্তে ও অর্দ্ধভগ্ন লাঠি বাম হস্তে ধারণ করিয়া দ্বিচক্র বৈদ্যুতিক যানের ন্যায় ঘুরাইতে

ঘুরাইতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবার তাহার গতি ভীষণাদপি ভীষণ হইয়া উঠিল। সেরূপ দুর্ব্বার লাঠি চালনা বিপক্ষদল জন্মেও কখনও দেখে নাই। তাহারা একান্ত হতাশ ও ভীত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। চাঁদ তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবনে দূরীকৃত করিয়া দিয়া পরিশ্রান্ত দেহে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখ-সংগ্রামে ভীত চৈৎসিংহ নামে একজন কাপুরুষ দণ্ডকারণ্যের বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত ছিল। সে চাঁদকে পরিশ্রান্ত দেহে ফিরিতে দেখিয়া নিঃশব্দে পশ্চাদ্দিক্ হইতে যাইয়া তাহার মস্তক লক্ষ্যে এমন জোরে আঘাত করিল যে, তাহাতে চাঁদ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইল। তাহার মাথা ফাটিয়া রক্তধারা ছুটিল। প্রবাহিত রক্তে ভূমি আর্দ্রীভূত হইয়া উঠিল। চৈৎসিংহ চীৎকার করিয়া কহিল —"শালা কো মার ডালা। তোম সব জলদী আও।" পলায়িত লাঠিয়ালগণ ফিরিয়া আসিল। এই সময় একখা জীব স্বর্ণ-প্রতিমা আলুলায়িত কুন্তলে, অতিব্যস্ত বাহু প্রসারিত করিয়া চাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অঘোরলাল দেখিয়া কহিল—"হাঁ হাঁ হামভি চাঁচ দেখ্খা, এহি মাই দেবঘরছে লাঠি ফেঁক্তা হায়।" অন্য এক জন দেশওয়ালী কহিল—"হাঁরে আর কেয়া দেখ্তা হায়, এহি লেড়কী, মহারাজকী, বহু হোতা হায়, ওসকো পাল্কীকা আন্দর ভার লেও।" তখন কতিপয় সর্দ্দার ধরাধরি করিয়া সঙ্গে আনীত পাল্কীর মধ্যে সেই স্বর্ণপ্রতিমাখানি তুলিয়া যাজপুরের দিকে রওনা হইল। এতক্ষণে মহামায়া "হায়

কি হইল” বলিয়া চীৎকার করত সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় ভূপতিতা হইলেন। পদ্মা চীৎকার করিয়া উঠিল।

লাঠিয়ালগণ চাঁদকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তাহার নিশ্বাস বন্ধ, হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাণবায়ু শেষ হইয়াছে। তখন দস্যুগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখের মাঠের মধ্যে লইয়া গেল। উদ্দেশ্য—তথা হইতে তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া রঘুরামকে উপহার দিবে ও কবন্ধটি যমুনায় ডুবাইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দেলওয়ার খাঁ নামে আফগান দেশীয় একজন সর্দ্দার ছিল, সে রঘুরামের বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ সর্দ্দার হইলেও প্রভুর ন্যায় নিষ্ঠুর ছিল না। সে কহিল—“মৃত ব্যক্তির মাথা কাটিয়া লইয়া কি লাভ? ইহাকে কবরস্থ করা হউক।” গণপতি নামে সর্দ্দার কহিল,—“তাহা হইলে আমাদের উপর বিপদ্ চাপিতে পারে।” দেলওয়ার কহিল,—“আমি মোরদারের (১) মাথা আমার জীবন থাকিতে কাটিতে দিব না। ইহার জন্য মুনিব তোমাদিগকে পুরস্কার না দিলে আমি দিব এবং তোমাদের সকলের জবাব দিবার জন্য আমি দায়ী থাকিলাম।” শিবরাম গোয়ালা কহিল,—“ভাই দেলওয়ার, তোমার কথাও থাক আমাদের কথাও থাক্; ইহাকে আস্ত যমুনায় ডুবাইয়া দেওয়া হোক্।” অনেক বাদানুবাদের পর তাহাই স্থির হইল। দেলওয়ার খাঁ নিজে যাইয়া চাঁদকে যমুনায় ফেলিয়া দিয়া আসিল। তথাপি মাথা কাটিতে দিল না।

---

(১) শবের।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

⁂

পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী।

চাঁদের মাথা কাটিয়া না আনিয়া লাঠিয়ালেরা যে তাহার প্রাণনাশ করিয়া যমুনায় ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহা শুনিয়া রঘুরাম অসন্তুষ্ট হইলেন না। পরন্তু তারাকে হাতে পাইয়া তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূর হইয়াছে, তিনি উদ্দাম বাসনা-বশে সেই রাত্রিতেই তারার গৃহে উপস্থিত হইলেন। রঘুরামের বিধবা ভগিনী দেবযানীর শয়ন-গৃহসংলগ্ন সদর-প্রকোষ্ঠে তারাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

রঘুরাম তারার নিকটে উপস্থিত হইয়া অনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে পরিহাস করিয়া কহিলেন,—"তারাদেবি, তোমার বকুলফুলের মালাছড়াটি সঙ্গে আনিয়াছ কি ?"

তারা নিরুত্তর। সে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা হৃদয়ে অনুভব করিতেছিল।

রঘু। ছি ছি! কি ঘৃণার কথা! বিবাহে লুকোচুরী খেলিয়া শেষে যবন-ভৃত্যের গলে মাল্যদান! তুমি ব্রাহ্মণকুমারী, তোমার কি ইহাই কর্ত্তব্য!

তারা তথাপি নিরুত্তর।

রঘু। যা'হোক্, এখন তুমি আমার হইয়া রাজরাণী-পদে বরণীয়া হও। তোমাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসিয়াছি। এ ভালবাসা জন্ম জন্মান্তরেও ছিন্ন হইবে না।

এই বলিয়া রঘুরাম তারার হাত ধরিতে উদ্যত হইলেন। তারা পশ্চাৎপদ হইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"আমি অশুচি, অদ্য হইতে পাঁচদিন আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" তারা কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই; অনন্যোপায় হইয়া আজ সে মিথ্যা কথা কহিল। রঘুরাম হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন এবং পাঁচদিন পর তাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, ইহা বুঝিয়া ধৈর্য্যধারণ করিলেন।

মিলনাশায় প্রতিবন্ধকতা না থাকিলেও মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়টি নানা সন্দেহের আকুল-তরঙ্গে, নায়ক-হৃদয় উদ্বেলিত হইতে থাকে। এ আবার বলপূর্ব্বক মিলনের আশা। রঘুরাম তারার ঘরে তালাবন্ধের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। দেবযানী অগ্রসর হইয়া কহিল,—"তালাবন্ধের আবশ্যক কি? আমিই চোকে চোকে রাখিব।" দেবযানী বয়ঃকনিষ্ঠা ভগিনী। রঘুরাম তথাপি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বাহির-বাড়ী চলিয়া গেলেন, কিন্তু রাত্রির জন্য সদরদ্বার ও খিড়কীর দ্বারে পাহারার বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিলেন না। সদরদ্বারে দুর্জ্জয়সিংহ ও অন্দর-দ্বারে দেলওয়ার খাঁন পাহারায় নিযুক্ত হইল।

ভাবুকজন বলেন,—তটিনীর গতি ও প্রেমের প্রকৃতি একই প্রকার। সাগর-পতিসঙ্গমে প্রধাবিতা স্ফীতবক্ষা তটিনী সম্মুখে বাধা পাইলে যেমন আরও বর্দ্ধিতবেগে উছলিয়া উঠে এবং

যেমন বাধাবিঘ্নই হউক না কেন বিচ্ছিন্ন করিয়া দয়িতসঙ্গমে চলিয়া যায়; প্রেমও তেমনি বাধা পাইলে বিক্রান্ত কেশরীর ন্যায় অধিকতর তেজে ফুঁফিয়া উঠে এবং প্রেমাস্পদ-মিলনে আকুলী-বিকুলী হইয়া ছুটাছুটী করিতে থাকে।

প্রেমপীযূষ যখন তারার হৃদয়ে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই সে চাঁদকে মাল্যদানে উদ্যত হয়, কিন্তু রঘুরাম বাধা দেওয়ায় তাহার সে প্রেম আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহা অসীম শক্তিশালী অনন্তের কূলাভিসারী। কাহার সাধ্য ইহার সম্মুখে দাঁড়ায় বা গতিরোধে সমর্থ হয়? এ প্রেম স্বর্গীয় শাশ্বত নিষ্কাম নিঃস্বার্থ। দেওয়া আছে পাওয়া নাই, চাহিবার আকাঙ্ক্ষাটি পর্য্যন্ত নাই। এ প্রেমের বদলে তাহাকে তুমি স্বর্ণময় সসাগরা সহস্র বিশ্বের শৌর্য্যশালী নবকান্তি নবীন যুবক সম্রাট্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে বল, তোমার অনুরোধ ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইবে।

তারার আজ আহার নিদ্রা নাই, অন্য চিন্তা নাই; কবির-গাথা ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিলে বলা যায়,—

চাঁদধ্যান, চাঁদজ্ঞান, চাঁদ-চিন্তামণি,
চাঁদহারা তারা এবে মণিহারা ফণী।

বস্তুতঃ চাঁদশোকে তারা এখন নিদারুণ ভাবে অভিভূতা। গত প্রেমসাধনার বিষয়গুলি পর্য্যায়ক্রমে প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার সুকোমল হৃদয়কে বল্মীকমধ্যস্থ মৃৎপঞ্জরের ন্যায় শতধা ছিদ্র করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই প্রত্যেক ছিদ্রপথে বিরহের

চিতানল লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া, তাহাকে পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। অথবা পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর দেহে আগুন ধরাইয়া দিলে তাহার যেমন দশা হয়, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। আবার এই নিদারুণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডদহনশীল হৃদয়-যাতনা কাহার নিকট খুলিয়া বলিবারও উপায় নাই। এমনি অপূর্ব্ব প্রেম-সাধনায় সে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল!

অসহনীয় হৃদয়ানলে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া তাহার প্রথম দিন অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিনের অবস্থা তাহার আরও ভীষণভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিল। কৈশোরের প্রারম্ভে যাহার জন্য সে প্রেমের বীজ কমনীয় হৃদয়োদ্যানে বপন করিয়াছিল, যৌবনের প্রারম্ভে যে বীজ অঙ্কুরিত বর্দ্ধিত ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল, যে বীজ হইতে বর্ত্তমানে চারাগাছে ফুল ফুটিয়াছিল, যে ফুলের সৌরভে তাহার পূত মনোহর চিত্তক্ষেত্র আমোদিত হইয়া গিয়াছিল, হায়! সেই ফুলের অধিপতি প্রিয়তমের চোকে-দেখা দশা পুনরায় মানসচক্ষে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; তাহার পর অবসন্নদেহে ঢলিয়া পড়িয়া ছিন্নশির অজার ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

তৈলাভাবে প্রদীপ যেমন ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ—ক্রমে ক্রমে হীন-জ্যোতিঃ হইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তাহার অবস্থা এখন সেইরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রাণেশ্বর চাঁদের অভাবে তাহার শত আশা—সহস্র কল্পনা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে; প্রিয়তমের জন্য নীরব বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে তাহার মনঃপ্রাণ শক্তিশূন্য হইয়া আসিয়াছে। নীরব চিন্তা ও নীরব

ধ্যান-ধারণাও ক্রমে তিরোধানমুখী হইয়া পড়িয়াছে। উগ্র-তপশ্চারিণী প্রেম-সন্ন্যাসিনীদিগের এই অবস্থা ভীষণাদপি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ। ইহা মৃত্যু-যন্ত্রণার নামান্তর। কিন্তু দয়াময় ইহার নিদ্রারূপ উপশম-ঔষধও বিহিত করিয়া রাখিয়াছেন; নতুবা সৃষ্টি পুড়িয়া ভস্মাচলে পরিণত হইত। তাই নিদ্রা আসিয়া তারাকে শান্তিরাজ্যে লইয়া গেল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, আবার নিদ্রানুচর স্বপ্ন তাহাকে কখন কাঁদাইতে কখন হাসাইতে লাগিল। তারা প্রথমে দেখিল, সে জ্বলন্ত-চিতায় মৃত পতিপার্শ্বে শয়ন করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আবার দেখিল, সে ইন্দ্রালয় বিনিন্দিত এক সুশোভন সুবিশাল রাজপুরীর অধীশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছে। শত শত দাস-দাসী আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহার চরণসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তৃতীয় বার দেখিল, সে রামসহ সীতার ন্যায় চাঁদের সহিত প্রকৃতির রুচির-কানন দণ্ডকারণ্যে সানন্দে বিচরণ করিতেছে। কখন গোদাবরী-কোকনদ-কুণ্ডলে কর্ণশোভিত করিয়া বনদেবী সাজিতেছে, কখন পঞ্চবটীর লতাবিতানে বসিয়া চাঁদের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। সে আরও দেখিল, এইরূপ বনবিহারকালে একটা দর্শনমোহকর হরিণ নাচিতে নাচিতে তাহাদের নিকুঞ্জসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কৌতূহলবশে চাঁদকে কহিল—এইটি ধরিয়া দাও। প্রেমময় চাঁদ তাহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু সে এক বিকটাকার ভীষণ ব্যাঘ্র-কবলে পতিত হইল। তারা চাঁদের প্রাণাত্যয়াশঙ্কায় চীৎকার

করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জ্জগৎ তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল; চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তারা চিন্তা করিতে লাগিল—হায়! কি দেখিলাম, এ যে স্বপ্ন! স্বপ্ন কি সত্য হয়?

তৃতীয় দিনে তারার মনের অবস্থান্তর ঘটিল। তাহার চিত্ত আজ নির্ব্বিকার ও একান্ত প্রশান্ত। তাহার যেন শোকদুঃখ কিছুই ঘটে নাই। বারংবার অগ্নিদগ্ধ কষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাহার হৃদয়ের প্রেমরত্ন আজ পূত হইতে পূততর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন একমাত্র চিন্তা—চাঁদের পরিণাম কি হইল? জানিতে পারিলে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। কিন্তু জানিবার উপায় কি? সে যে পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী। তাহার এ দুঃখের অনুভূতিতে কে সহানুভূতি দেখাইবে? দিন অতিবাহিত হইল, রাত্রি আসিল। ক্রমে রাত্রি দ্বিযাম অতিক্রম করিয়া তৃতীয় যামে উপস্থিত হইল। তারার চক্ষে নিদ্রা নাই। দেবযানী তারার অবস্থা জানিতে নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। তারার গৃহে সাড়াশব্দ নাই। সে ভাবিল তারা নিদ্রিত। দেবযানী প্রতিরাত্রিতে গোপনে এইরূপে তারার তত্ত্ব লয়। এ দিন তত্ত্ব জানিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় সে খিড়কীর দ্বারে গুন্ গুন্ শব্দ শুনিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। খিড়কীর বিশ্বস্ত প্রহরী দেলওয়ার খাঁন তন্দ্রা দূরীকরণ মানসে ঐরূপ গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছিল। দেবযানী জিজ্ঞাসা করিল—"খিড়কীদ্বারে কে ও?" দেলওয়ার খাঁন চমকিয়া উঠিয়া কহিল,—'দিদি ঠাকরুণ, খাকছার দেলওয়ার।"

দেবযানী কহিল,—"তা বেশ, থাক।" দেলওয়ার যে ওখানে পাহারায় আছে দেবযানী তাহা জানে। দেলওয়ারও দেবযানীর কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারে।

দেল। দিদি ঠাক্‌রুণ!

দেব। কি, বল?

দেল। ঘুমে চোক ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। দোক্তায় চূণ নাই; একটু চূণ।

দেব। দরজা খুলিয়া দিতেছি, সাবধানে ভিতরে আসিয়া লইয়া যাও।

দেলওয়ার বাহিরের তালা খুলিয়া ভিতরে আসিল। দরজা উভয় দিক্ হইতে বন্ধ করা হইয়াছিল। দেবযানী গৃহান্তর হইতে চূণ আনিয়া দেলওয়ারের হাতে দিলে, দেলওয়ার প্রস্থানে উদ্যত হইল। দেবযানী কি যেন মনে করিয়া দেলওয়ারকে কহিল—"ভাই, অমরাবতীর ঠাকুরবাড়ীর চাকরটাকে কি সত্যই খুন করিয়া যমুনায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে?" এ প্রসঙ্গ দেবযানী দুর্জ্জয় পাঁড়ের নিকটে আংশিক শ্রবণ করিয়াছিল।

দেল। হাঁ দিদি, আমিই তাহাকে যমুনায় ডুবাইয়া দিয়াছি।

দেলওয়ারের স্বরে বেদনার ভাব ব্যক্ত হইতেছিল; চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

দেবযানী দেলওয়ারের কথার ভাবে কহিল,—"তুমি অমন দুঃখের স্বরে কথা বলিতেছ কেন?"

দেল। দিদি ঠাক্‌রুণ! সে একে জাত ভাই, তার উপর

ওরূপ রূপবান্ বলশালী যুবক আমি কখন দেখি নাই। এখন মনে হইতেছে আমি হিন্দুস্থানের একটি রত্ন যমুনায় বিসর্জ্জন দিয়াছি।

দেব। তোমার চেয়েও বলশালী?

রঘুরামের সর্দ্দারগণের মধ্যে দেলওয়ার সর্ব্বাধিক বিক্রমশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

দেল। আমাদের একশত লাঠিয়ালকে সে একাই ঠেঙ্গাইয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

দেব। বাপ্‌রে! তবে তাহাকে খুন করিলে কিরূপে?

দেল। আমরা হটিয়া আসিলে শেষে চৈৎ সিং গোপনে পাছের দিক্ দিয়া যাইয়া লাঠির আঘাতে তাহার মাথা ফাটাইয়া দেয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দেব। লোকটা কি অপরাধ করিয়াছিল?

দেল। জানি না। রাজরাজার কাণ্ড।

দেব। দাদার কাণ্ডই ঐরূপ ভীষণ।

দেল। দিদি ঠাক্‌রুণ, অমরাবতীর মাতাজি কোন্ ঘরে?

দেবযানী অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিল।

দেল। জাগিয়া নাই ত?

দেব। আমি তত্ত্ব লইয়াছি, সে ঘুমাইতেছে।

মেয়েলোক কথা পাইলে সহজে ছাড়ে না, আবার পুরুষ মানুষও মেয়েদের সহিত কথা বলিতে ভালবাসে। সুতরাং দেলওয়ার ও দেবযানীতে এইরূপে কথায় কথা বাড়িয়া চলিল।

এই কথোপকথন হইতে তারা চাঁদের মৃত্যুর কথা শুনিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিং। লইল এবং নিঃশব্দে মুক্তদ্বারপথে বাহির হইয়া পড়িল।

সম্মুখে যমুনা। গিরিরাজ-নন্দিনী শ্যাম-সোহাগিনী যমুনার সকলি সুন্দর, সকলি প্রাণারামদায়ী। যমুনার পর্জ্জন্যবর্ণ-স্বচ্ছ-শীতল বারিরাশি বড়ই সুন্দর! স্রোতস্বিনীর মৃদুমন্দ কলধ্বনি মনোমদ, বীচিবিভঙ্গ-কলতান অতি শ্রবণ-সুখকর! তদুপরি শুভ্র ফেন-পুষ্পমালা আরও মনোহর! ক্ষীরসরসম সৈকতভূমি সৌন্দর্য্যের চবম অভিব্যক্তি! সুবঙ্কিম তটের প্রকৃতি-কুন্তল শ্যামল বৃক্ষরাজী কত নেত্রস্নিগ্ধকব! আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ্; নিঃস্বার্থদাতা চন্দ্র শুভ্র স্বচ্ছ কিরণ দানে যমুনাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। আজ যমুনার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে সুষমা-জ্যোতিঃ যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

যমুনা একদিকে যেমন অনন্ত সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, অন্যদিকে তেমনি বহুগুণের জননী। যমুনার মত বিরহসন্তাপহারিণী আর কে আছে? একদিন বিরহবিদগ্ধা ব্রজবালাগণের যমুনাই শান্তি-দাত্রী ছিল। কৃষ্ণময়প্রাণা প্রেমপাগলিনী রাধা যমুনার জলে অবগাহন করিয়া বিরহজ্বালা জুড়াইয়াছিলেন। তারা আজ সেই সন্তাপনাশিনী যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া।

যামিনী ত্রিযাম অতীত। প্রকৃতি রাণী হীরার ফুলে খচিত নীলাভ মকমলের চাদর গায়ে দিয়া বিঘোরে নিদ্রিতা। জগৎ আজ চাঁদের অনন্ত সৌন্দর্য্যে প্রফুল্ল; কিন্তু তারার হৃদয়ে চাঁদ-বিরহ।

বিরহজ্বালায় এই স্নিগ্ধ বিশ্বসৌন্দর্য্য আজ তাহার চক্ষে দগ্ধ অঙ্গারবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সে ভাবিতেছে---যাহার জন্য এ জীবন, সেত এই যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত! তবে আর বাঁচিয়া থাকা কেন? বৃথা প্রাণধারণে লাভ কি? এইরূপ ভাবিয়া সে যুক্তকরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিল—"দয়াময়, দীনবন্ধো, এ জীবন-তরণী যমুনায় ভাসাইলাম—ইহা যখন অনন্তের কূলে যাইয়া লাগিবে, তখন দাসী যেন প্রেমাস্পদের চরণ পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারে।" এই বলিয়া প্রেমোন্মাদিনী বালিকা যমুনা-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

রঘুরামের নিষ্ঠুরতা।

পরদিন প্রাতে তারার পলায়নে রাজবাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। রঘুরাম ভাবিতে লাগিলেন, দুর্জ্জয় ও দেলওয়ার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য। দেবযানী পরম হিতৈষিণী সহোদরা। ইহাদের সতর্কদৃষ্টির মধ্য হইতে শিকার কিরূপে পলাইল? বিবাহের রাত্রির পলায়নে ও আজিকার পলায়নে তাঁহার ধারণা হইল যে, সে মানবী নহে—মায়াবিনী; কোন উদ্দেশ্য সাধনে ঠাকুরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ভাবিয়া রঘুরাম কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় খেয়ালবশে মায়াবিনী তারার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। দেলওয়ার খাঁ ঘুরিতে ফিরিতে যমুনার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে এক পাটনী খেয়া দিতেছিল। দেলওয়ার তাহাকে অল্পমাত্রায় জানে শুনে, কিন্তু পাটনী দেলওয়ার খাঁকে পূরাহালেই চিনে।

দেলওয়ার পাটনীকে জিজ্ঞসা করিল,—"তুমি কি রাত্রিতে এখানে থাক?"

পাটনী। আজ্ঞে না।

দেল। কোথায় থাক ?

পাটনী তটবর্ত্তী খেজুরের কুটীর দেখাইয়া কহিল,—"মহারাজের পাশের ঐ ঘরে।"

দেল। গত রাত্রিতে কোন স্ত্রীলোককে এখানে আসিতে দেখিয়াছ কি ?

পাটনী। আজ্ঞা না। কিন্তু—

দেল। কিন্তু কি ?

পাটনী। মহারাজ আমার পোড়া কপাল! তাই আজ শেষ রাত্তিরে দুর্গা ঠাক্‌রুণের দেখা পাইয়াও পাইলাম না।

দেল। তিনি কোথায় গেলেন ?

পাটনী। এই ঘাটে স্নান করিতে নামিলেন, আর উঠিলেন না। আমি ভোর বেলা পর্য্যন্ত যমুনার এপার ওপার খুঁজিয়া আর তাঁর দেখা পাইলাম না।

ঠাকুর-কন্যা যে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে দেলওয়ারের তাহাই ধারণা হইল। পরন্তু তাঁহার অসাবধানতায় যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সে যারপর নাই অনুতপ্ত হইতে লাগিল। সে অতঃপর পাটনীকে কহিল,—"চল, দুর্গা ঠাক্‌রুণের স্নানের কথা তোমাকে কুমার বাহাদুরের নিকটে বলিয়া আসিতে হইবে। না হলে, তিনি বিশ্বাস করিবেন না।"

পাটনী। দোহাই মহারাজ, গরিবকে অমন বাঘের সাম্‌নে নিবেন না।

দেল। তোমার কোন ভয় নাই। আমি সঙ্গে থাকিব।

পাটনী। আপনার পায়ে পড়ি মহারাজ, আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যান।

দেল। তুমি এত ভয় করিতেছ কেন?

পাটনী। মহারাজ, আজকাল চাষী গেরেস্ত সকলেই কুমারের হুকুমে ভয়ে জঙ্গলে পলাইতেছে।

দেল। তাতে তোমার কি?

পাটনী। মহারাজ, আমার জোতজমা নাই। কেবল তিনখানি ঘর আর এই বাড়ীখানি।

দেল। তাতে ভয় কি?

পাটনী। আমি সারা বছরে যা রোজগার কর্‌চিলাম, সবই সেই বাড়ীর খেরাজ খরচায় গেছে।

দেল। তোমার খাজনা পত্রর শোধ হয়ে থাক্‌লে সেত ভাল কথা।

পাটনী। আবার বাদশার কোন্ জাগায় যেন লড়াই বাঁধবে।

দেল। তাতেই বা তোমার ভয় কি?

পাটনী। তার খরচার জন্যি গাঁয়ে তসুলদার বসেছে। আমি খেরাজের দশ গুণ হারে খরচা আদায় কর্‌তেচেন। খরচা দিতে না পারায় বাঁশ-চাপা দিয়া টেঙ্গু, ধনা ও শিবাকে মেরে ফেলচেন। আপনার কাছে তাতো ছাপা নাই। তাই সিকি লোক এ গাঁ থেকে পলাইয়াছে।

দেল। তা আমার সঙ্গে গেলে তোমার কোন ভয় নাই?

পাটনী কাঁদিয়া ফেলিল। শেষে কহিল—"মহারাজ, পারের কড়ি আমাব কাছে তিন দেরাম আছে, আপনার চরণে এই উপার দিলাম, আমাকে ছাড়িয়া যান।"

দেল। তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না?

পাটনী। মহারাজ, বিশ্বাস করি কিন্তু আমি লড়াইএর খরচা এ পর্য্যন্ত দিয়া উঠ্‌তে পারি নাই।

দেল। সে খরচা তোমার কত লাগিবে?

পাটনী। তিনকুড়ি তঙ্কা তলব করেছেন।

প্রজার প্রতি রঘুরামের অত্যাচার অবিচারের কথা দেলওয়ার জানে এবং অন্যরূপ দুই একটি কাজে সে মুনিবের অত্যাচারের সহায়তাও করিয়াছে; কিন্তু পাটনী আজ তাহাকে জুলুমের যে খতিয়ান দেখাইল, তাহাতে দেলওয়ারের দেলের ভাবান্তর ঘটিল। এতগুলি অত্যাচার একত্র করিয়া সে আর কখন দেখে নাই। আজ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং মনে মনে কহিল, আজকার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া আর এ পাপ পুরীতে পাপীর গোলামী করিব না; দেশে চলিয়া যাইব। অতঃপর দেলওয়ার পাটনীকে কহিল—"তুমি আমার সহিত চল, আমি মোসলমান, কসম করিয়া বলিতেছি, তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগিবে না।" পাটনী আশ্বাস পাইয়া বিশ্বাসের সহিত দেলওয়ার খাঁর সহিত রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং দুর্গা ঠাকুরুণ সম্বন্ধে রঘুরামের নিকট জবানবন্দী দিল। রঘুরাম শুনিয়া পরিষ্কার বুঝিলেন দুর্গারূপিণী তারা

জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কহিলেন,—“এ সংবাদ তুই তখনি আমাকে দিস্ নাই কেন?”

পাটনী। দেব্‌তার কাণ্ডকারখানার কথা হুজুরকে জানাইতে হইবে ইহা বুঝিতে পারি নাই।

রঘু। চৈৎ সিং!

চৈৎ। মহারাজ।

রঘু। এই পাটনীকে এখনই পঁচিশ জুতা গণিয়া মার।

দেল। হুজুর, পাটনীকে প্রহার করিবেন না।

রঘু। কেন?

দেল। আমি উহাকে অভয় দিয়া হুজুরের নিকটে আনিয়াছি।

রঘু। তা আন, কিন্তু শাস্তি না দিলে ছোটলোকের শিক্ষা হয় না। লাগাও জুতা।

চৈৎ সিং প্রহারে উদ্যত হইল। দেলওয়ার তাহাকে সক্রোধে কহিল,—“সাবধান চৈৎ সিং, পাটনীর গায়ে আঘাত করিলে আমি এই মুহূর্ত্তে ইহার প্রতিশোধ লইব!” এই বলিয়া দেলওয়ার চৈৎ সিংএর হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিল। এই অবসরে পাটনী দেলওয়ারের ইঙ্গিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

রঘুরাম দেলওয়ারের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং দুর্জ্জয় ও শিবরাম প্রভৃতি সর্দ্দারদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—“তোমরা এখনই এই ক্ষিপ্ত ভৃত্যটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।”

দেলওয়ার নির্ভয়ে কহিল—“অত্যাচারী মহাপাপী মনিব অপেক্ষা ক্ষিপ্ত ভৃত্য উত্তম!”

রঘুরাম বিষমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তজবারাগ ধারণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন—"রে নিমক-হারাম ভৃত্য! আমি অত্যাচারী, আমি মহাপাপী!—তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! সর্দ্দারগণ, তোমরা এখনই এই পাপিষ্ঠকে হস্তপদ নিগড়বদ্ধ করিয়া হাজত-খানায় লইয়া যাও এবং পাথর চাপা দিয়া ইহার প্রাণবধ কর।"

সর্দ্দারগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ!

যে দুর্জ্জয়, শিবরাম, ধনপৎ, লছমন প্রভৃতি সর্দ্দারগণ দেলওয়ার খাঁর আজ্ঞাকারী সমব্যবসায়ী সহচর বন্ধু, যাহারা দেলওয়ারকে নেতা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে, তাহারা আজ তাহার প্রাণবধের হুকুম পাইয়া তাঁহাকে বাঁধিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইল না! দুর্জ্জয় শৃঙ্খল লইয়া অগ্রসর হইল। দেলওয়ার এক পদাঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিল। রঘুরামের আদেশে তখন সমস্ত সর্দ্দার একত্র হইয়া দেলওয়ারকে চাপিয়া ধরিল। দেলওয়ার সর্দ্দারগণের চাপে পড়িয়া আনায়-নিবদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বহু বলশালী বিপক্ষের সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া ক্রমশঃ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল। সর্দ্দারগণ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হাজত-খানায় লইয়া গেল। পাথর চাপা থাকিয়া তিনদিন পরে দেলওয়ার খাঁর পুণ্যাত্মা পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাইল্লিনে (১) উপস্থিত হইল।

---

(১) পুণ্যাত্মগণের বাসস্থান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষমা।

ঠাকুর মহাশয় দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পারিবারিক দুরবস্থার কথা অবগত হইলেন এবং রঘুরামের নিকটে উপস্থিত হইয়া কন্যা ও ভৃত্যের দাবী করিলেন। না দিতে পারিলে খোদ বাদশাহের নিকটে নালীশ দায়ের করিবেন ইহাও জানাইলেন।

রঘুরাম প্রথমে ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে কন্যা ও ভৃত্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক জন্মাইবার নিমিত্ত চাঁদের গলে তারার মাল্যদানের কথা, উভয়ের গুপ্তপ্রণয়ের কথা এবং তাহার যমুনায় ডুবিয়া মরার কথা বলিলেন এবং জাতিগত প্রভেদও দেখাইয়া তারাকে কুলকলঙ্কিনী প্রতিপন্ন করত অশ্লীলভাবে নানাছাঁদে বর্ণন করিলেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় রঘুরামের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না, ববং রঘুরামকেই হীনচরিত্র পাষণ্ড ভাবিয়া তিরস্কার করিলেন। দিল্লীতে নালীশ রুজুর কথা শুনিয়া রঘুরামের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি ঠাকুর মহাশয়ের কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না ; পরন্তু তাঁহাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তোড়াবন্দী পঞ্চ সহস্র মুদ্রা তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তেজস্বী ঠাকুর মহাশয় পঞ্চসহস্র মুদ্রাকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞানে

তৎপ্রতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। রঘুরাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর মহাশয় পথে আসিতে আসিতে বিবেকের সহিত বুঝাপড়া আরম্ভ করিলেন। বিবেক তাঁহাকে বলিল,—"এখন কি করিবে ?"

ঠা। খোদ বাদশার নিকটে অভিযোগ আনয়ন করিয়া কন্যা ও ভৃত্য-হত্যার প্রতিশোধ লইব।

বিবেক। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, বাদশা জানিলে ও প্রমাণ পাইলে নিশ্চয়ই রঘুরামের প্রাণদণ্ড বিধান করিবেন।

ঠা। আমি তাহাই চাই।

বি। তাহা হইলে কি কন্যা-ভৃত্য ফেরত পাওয়া যাইবে ?

ঠা। না পাইলেও অত্যাচারের প্রতিশোধে পাপীর শিক্ষা হইবে।

বি। ওরূপ শিক্ষাদানে মহতের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়।

ঠা। অত্যাচার সহ্য করাও কাপুরুষতা। বিশেষতঃ প্রাণাধিক কন্যা ও ভৃত্যের হত্যামূলক অত্যাচার।

বি। ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির এতদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারসমূহ ধীরতার সহিত সহ্য করিয়াছেন এবং ক্ষমাগুণ প্রকাশে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

ঠা। তাহা হইলেও রঘুরাম ক্ষমার যোগ্য নহে !

বি। পাষণ্ডকে ক্ষমা করাই মহত্ত্ব। তাহাতেই তাহার উত্তম শিক্ষা হয়।

ঠা। তাহা হইলে আমিও ক্ষমা করিলাম।

বি। তোমার মহোচ্চ মনের আশ্রয় লইয়া আমিও আজ ধন্য হইলাম।

অতঃপর ঠাকুর মহাশয় কন্যা ও ভৃত্যের শোক বুকে করিয়া ভাঙ্গা প্রাণে নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দিল্লীর এক বরকন্দাজ বাদশাহের মোহরাঙ্কিত পত্রহস্তে ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাজিমের সহিত পত্র গ্রহণ করিয়া খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"প্রিয় গঙ্গাঠাকুর,

আপনি আপনার যে কৃষাণ ভৃত্যের নির্লোভ মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া অগৌণে রাজধানীতে উপস্থিত হইবেন। বিশেষ প্রয়োজন আছে জানিবেন।" ইতি—

ঠাকুর মহাশয় পত্র পাঠান্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বাদশার নিকটে তিনি কি জবাব দিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাদ্শাহের বিচার।

আজ ভুবনরম্য হাজার ছতুনে গোলজার দরবার। সাহান শাহ ভারত-সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলক বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। শিল্পীর সূক্ষ্ম-চরম-বোধ-সঞ্জাত স্বুবর্ণ-খচিত নয়নমনোহর তালবৃন্ত হস্তে কিঙ্করগণ বাদশাহের দেহে সুধীরে সমীরণ সঞ্চালন করিতেছে। তাঁহার মণিময় কিরীটশিরঃস্থ শিখিকলাপ তাহাতে ঈষদান্দোলিত হইতেছে। কলকণ্ঠ বৈতালিকের সুতানলয়-স্তব-স্বর-লহরী হাজার ছতুনের সহস্র স্তম্ভে প্রতিধ্বনিত হইয়া সভাসীন জনমনোভাব বিহ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্রাটের প্রধান জজ, বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন্‌বতুতা, প্রধান কাজি ইমদাদুল খাঁ, উজির মালেকজাদ সম্রাটের সম্মুখে সসম্মানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অন্যান্য ওমরাহগণও যথাযোগ্য আসনে নীরবে উপবিষ্ট। সভার এক পার্শ্বে ঠাকুর মহাশয় নতশিরে শুষ্কমুখে দণ্ডায়মান। অপর পার্শ্বে শৃঙ্খলিত রঘুরাম ও তাহার লাঠিয়ালগণ যূপকাষ্ঠবদ্ধ পশুর ন্যায় দণ্ডায়মান।

স্তাবক-সঙ্গীত শেষ হইলে বাদশাহ ধীরে ধীরে গম্ভীরে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গঙ্গাঠাকুর, আপনার সে কৃষাণ ভৃত্য কোথায় ?" বাদশাহের জিজ্ঞাসায় ঠাকুর মহাশয় কিংবক্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

বাদশা। ঠাকুর, আপনার চাকরকে কি আপনি সঙ্গে আনেন নাই ?

ঠা। খোদাওয়ান্দ, দুনিয়ার মালিক,—

বা। বুঝিয়াছি, কেন তাহাকে সঙ্গে আনেন নাই ?

ঠা। আমি এখান হইতে বাড়ী যাইয়া শুনিলাম, সে যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সকলের বিশ্বাস, তাহাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে।

বা। আপনি গণনা করিয়া দেখিলেইত জানিতে পারিতেন তাহাকে কুম্ভীরে খাইয়াছে কি না ?

ঠা। ভৃত্যকে আমি স্বপরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতাম। পারিবারিকগণনায় গুরুর নিষেধ আছে। তাই গণনা করি নাই।

বা। এমন দুর্ঘটনাতেও গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে ?

ঠা। আমার যথাসর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইলেও আমি গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহি।

বাদশা। এখন যদি সেই ভৃত্যকে ফিরিয়া পান তাহা হইলে আপনি কি সন্তুষ্ট হন না ?

বাদশাহের কথা শুনিয়া রঘুরামের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, বধ্যভীত লোকের ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। নিগড়-

বদ্ধ লাঠিয়ালগণের অন্তরে আতঙ্কের ঝড় বহিতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শী বাদশাহ সমস্তই লক্ষ্য করিলেন। ঠাকুর মহাশয় সবিস্ময়ে আকাশ হইতে যেন পাতালে পড়িয়া গেলেন। কোন উত্তর করিলেন না। বাদশাহ পুনরায় কহিলেন,—"ঠাকুর, আমি মিথ্যাবাদী কপটাচারী ব্যক্তিকে লেলিহান কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।" ঠাকুর মহাশয়ের গা দিয়া ঘাম ছুটিল, কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া আসিল। এবারও কোন উত্তর করিলেন না।

বা। আপনার এক কন্যা আছে?

ঠাকুর মহাশয় ভাবিলেন, বাদশা কি অন্তর্য্যামী? এ সকল কথা কিরূপে অবগত হইলেন? গোপন ত ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রঘুরামকে ক্ষমা করিয়াও আর রক্ষা করা যাইবে না। সুতরাং অকারণ মিথ্যা কথা বলিয়া ঘৃণিত ভাবে কুক্কুরের কবলে যাই কেন? তাই তিনি কহিলেন,—"ছিল।"

বা। ছিল? এখন কোথায়?

ঠা। এখন নাই।

বা। কি হইয়াছে?

ঠা। যমুনায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে।

বা। ভৃত্যের পূর্ব্বে না পরে?

ঠা। পরে।

বা। কতদিন পরে?

ঠা। দুই দিন পরে।

বা। আপনার কন্যার বয়স কত হইয়াছিল।

ঠা। ১৪ বৎসর।

বা। আত্মবিসর্জ্জনের কারণ কি ?

ঠা। কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

বা। অপনি এখানে আসার পর আপনার বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল কি ?

এতক্ষণে ঠাকুর মহাশয়ের ধ্রুব ধারণা হইল, যে বাদশাহ সমস্ত কথাই অবগত হইয়াছেন ; তাই তিনি দিল্লী আসার পর রঘুরাম কর্ত্তৃক তাঁহার পারিবারিক নিদারুণ অত্যাচারাদি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা যথাযথ বলিয়া ফেলিলেন।

বা। আপনার নিজের এমন সর্ব্বনাশিনী ঘটনা গোপন করিতেছিলেন কেন ?

ঠাকুর। হুজুর, আমাদের শাস্ত্রে আছে, ঘোর শত্রুর প্রতিও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইবে না। পরন্তু ক্ষমাগুণে তাহার প্রতিশোধ লইবে। এই নিমিত্ত ভগবান্‌কে ভাবিয়া রঘুরামের সমস্ত অত্যাচার ক্ষমা করিয়াছিলাম, এবং সাহান শাহ হুজুরের বিচারেও তিনি যাহাতে রক্ষা পান তজ্জন্যই সত্যের অপলাপ করিতেছিলাম ; কিন্তু যখন বুঝিলাম ধর্ম্মাবতারের সূক্ষ্ম বিচারে কোন কথাই অপ্রকাশিত থাকিবে না, তখন মিথ্যা কথা বলিয়া পাতকগ্রস্ত হওয়ায় ফল কি ?

এই বলিয়া ঠাকুর মহাশয় পারিবারিক যাবতীয় দুর্ঘটনা পুনঃ আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বাদশাহ প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন

এবং পরক্ষণে ভারতের বহুমান্য রাজদরবারে ঠাকুর মহাশয়কে উপবেশনার্থ আসন দিতে আদেশ করিলেন।

বাদশাহ নিগড়বদ্ধ লাঠিয়ালগণের প্রতি আবার দৃষ্টিপাত করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাদশাহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিতেই প্রাণদণ্ড ভয়ে ভীত ঘনশ্যাম নামক জনৈক নবীন লাঠিয়াল, পুরস্কার দান প্রলোভন হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদের মাথাকাটা হুকুম, ঠাকুর-কন্যাকে বলপূর্ব্বক রাজপুরে লইয়া যাওয়া, তাহার পলায়ন, যমুনায় আত্মবিসর্জ্জন, সেইক্ষেত্রে রঘুরাম কর্ত্তৃক দেলওয়ার খাঁনের হত্যা প্রভৃতি ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়া বাদশাহ রঘুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহারাজ, ঠাকুর মহাশয় ও আপনার লাঠিয়াল কর্ত্তৃক কথিত ঘটনাবলী কি সত্য নয়?” রঘুরাম কোন উত্তর করিলেন না। বাদশাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি এমন লোমহর্ষণ অত্যাচারে অকারণ তিনটি মহাপ্রাণীর প্রাণনাশ কেন করিলেন?”

রঘু। ধর্ম্মাবতার, ঠাকুর মহাশয়ের ভৃত্য নিমকহারাম ও ব্যভিচারী ছিল। সে ঠাকুর-কন্যার সহিত গুপ্ত প্রণয় স্থাপন করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করত আমাদের ব্রাহ্মণকুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে! দেলওয়ার খাঁন খেরাজ আদায় সম্বন্ধে প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিয়া রাজদ্রোহী হইয়াছিল।

বাদশা। আচ্ছা, আপনি ভৃত্য কর্ত্তৃক ঠাকুর-কন্যার ধর্ম্মনাশের কি প্রমাণ পাইয়াছেন?

রঘু। আমি স্বচক্ষে ঠাকুর-কন্যাকে সেই ভৃত্যের গলে ফুলের মালা দিতে দেখিয়াছি।

বা। কোথায়, কেমন করিয়া দেখিলেন?

রঘুরাম বাধ্য হইয়া ঠাকুর-কন্যার সহিত নিজের বিবাহপ্রসঙ্গ, পাত্রীর আত্মগোপনের কারণানুসন্ধান প্রভৃতি ঘটনা বর্ণন করিয়া কহিলেন,—"আমি তদুপলক্ষে ঠাকুর-বাড়ীর বাগানমধ্যে ঠাকুর-কন্যাকে ভৃত্যের গলে প্রেমভরে মাল্যদান করিতে দেখিয়াছিলাম।"

এই সময় ঠাকুর মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাদশাহকে কহিলেন,—"বান্দা অভয়দান প্রার্থনা করিতেছে।"

বা। স্বচ্ছন্দে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ঠা। আমার কন্যা আজন্মসুশীলা। শৈশবকাল হইতে রামায়ণ শিক্ষা দিয়া তাহাকে সীতার অনুরূপ চরিত্রে গড়িয়া তুলিয়াছি। তাঁদের চরিত্রে আমরা পরিবারস্থ ও গ্রামস্থ কেহ কখন মন্দভাব দেখি নাই। দ্বাদশ বৎসর সে আমার আশ্রয়ে ছিল, এই সময় মধ্যে আমার স্ত্রী বা কন্যার প্রতি সে কখন মুখ তুলিয়া কথা বলে নাই। তাহার সংযম ও নির্লোভ ন্যায়পরতার কথা পূর্ব্বেই একবার ধর্ম্মাবতারের নিকটে নিবেদন করিয়াছি। অতএব আমার কন্যা ও ভৃত্যের প্রতি মহারাজের দোষারোপ সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহারাজ আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া এইরূপ অন্যায় কলঙ্কারোপ করিতেছেন।

বাদশাহ রঘুরামকে কহিলেন—"মহারাজ, আপনি ঠাকুর-কন্যাকে নিজবাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

রঘু। বিবাহ-বাসনায়।

বাদশা। সে কি! যে আপনার সহিত বিবাহের সময় আত্মগোপন করিল, পরে আপনি যাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া জানিলেন, তাহাকে পুনরায় বিবাহ করা, ইহা কি আপনাদের শাস্ত্রসম্মত?

রঘুরাম একথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। অগত্যা কহিলেন—"ঠাকুর মহাশয়ের জাতিরক্ষার জন্য বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম।"

বা। আপনাকে খুব পরহিতৈষী বলিয়া বোধ হইতেছে! যাহা হউক, আপনি ঠাকুর-কন্যাকে নিজগৃহে পাইয়া তাহার উপর পাশব অত্যাচার করিয়াছিলেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা কি ঠিক নহে?

রঘুরাম বাদশাহকে অন্তর্য্যামী ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেতসপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিল। মুখের বর্ণ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল।

এই সময় বাদশাহের আদেশে জনৈক প্রহরী একজন পরম সুন্দর যুবককে হাজার ছতুনের দূরস্থ প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর হইতে আনিয়া দরবারে হাজির করিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর মহাশয় বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। রঘুরাম জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। লাঠিয়ালগণের কার্য্যের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ জন্মিল। আবার মৃত্যুর ঝঞ্ঝাবাত-

প্রবাহে লাঠিয়ালগণের হৃদয়-নদে উত্তাল তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

বাদশাহের রত্নসিংহাসনসম্মুখে হজরত আলীর হস্তাক্ষরে লিখিত অমূল্যনিধি কোরাণ শরিফ সংরক্ষিত ছিল। বাদশা চিরদিনই এইরূপ কোরাণ শরিফ সম্মুখে রাখিয়া বিচারাদি করিতেন। আজ তিনি যুবককে সেই কোরাণ শরিফ স্পর্শ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি তোমার মনিব-কন্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছ?" লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে যুবকের নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে তদবস্থায় একবার সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। এক পার্শ্বে রঘুরামকে দেখিয়া ভাবিল—ইনিই এই ঘৃণিত মিথ্যা কলঙ্কের কথা বাদশাহের গোচর করিয়াছেন। সে বাদশাহের প্রশ্নোত্তরে কহিল—"ধর্ম্মাবতার, গোলাম ঠাকুর-কন্যাকে সর্ব্বদা মনিব-কন্যা জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। কোন পাপ চিন্তা গোলামের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। নুন খাইয়া নেমক-হারামী করা এ গোলামের স্বভাব নহে।"

বাদশা। ঠাকুর-কন্যা তোমার প্রতি কখন প্রেমের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল?

যুবক। গোলাম তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারে নাই।

বাদশা। সে কখন তোমার গলে ফুলের মালা দোলাইয়াছিল।

যুবক। না।

তারা যে তাহার গলে মালা দিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা সে বাস্তবিকই জানে না। তাহার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই রঘুরাম ক্রোধভরে তারার হাত হইতে মালা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং মালা সে দেখিতে পায় নাই।

বাদশা সহসা রঘুরামকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপের আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ আসিয়া রঘুরামের হাত চাপিয়া ধরিল। নির্ব্বাত বনস্থলী অকস্মাৎ বায়ুতাড়নে যেমন মড়্ মড়্ সর্ সর্ শব্দে মুখরিত হইয়া উঠে, বাদশাহের ভয়ানক আদেশ শ্রবণে সেই বিরাট্ নিস্তব্ধ সভাস্থল সন্ত্রাস সংক্ষোভে সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

ইবন্‌বতুতা প্রমুখ সভ্যগণ শিহরিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। এই সময় যুবক ধীরে বিনয়ে গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া বাদশাহের পদপ্রান্তে আরোজ করিল।

বা। তুমি কি চাও ?

যু। খোদাবন্দ, মহারাজের জীবন ভিক্ষা চাই।

তখন সেই বিপুল জনসঙ্ঘ বিস্মিত হইয়া যুবকের দিকে চাহিল। বাদশা যারপর নাই চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,—“যে ব্যক্তি তোমার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া প্রাণনাশ করিয়াছিল, তাঁহারই জীবন ভিক্ষা ?”

যুবক। হাঁ জাঁহাপনা, তাহারই জীবন ভিক্ষা।

বা। তুমি কেন এ প্রার্থনা করিতেছ ?

যুবক তখন বক্ষাবরণ উন্মুক্ত করিয়া বাদশাহকে দেখাইল।

বা। তোমার বুকে ও কিসের চিহ্ন ?

যু। ক্ষমার।

বা। বুঝিলাম না ; খুলিয়া বল।

যুবক। হুজুর, পূর্ব্বে যে লাঠিযুদ্ধের কথা বলিয়াছি, তাহার পূর্ব্বদিন মহারাজ ঠাকুর-বাড়ীর বাগানমধ্যে ঠাকুর-কন্যার কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহারে উদ্যত হইয়াছিলেন, আমি তাহাতে বাধা দেওয়ায় মহারাজ বিনামা-পদাঘাতে আমার বক্ষঃস্থলে রক্তের ধারা বহাইয়া ছিলেন। আমি ইচ্ছা করিলে তখনই তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিতাম, কিন্তু—

বা। কিন্তু কি ?

যু। হজরতের দান্দান (১) মাবারক সহিদের কথা মনে পড়িয়াছিল।

মহাত্মা ইবন্‌বতুতা প্রমুখ সভ্যগণ মার-হাবা মার-হাবা রবে সেই বিরাট্ সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। হজরত রছুলের গুণগরিমা স্মরণে এবং তৎসঙ্গে সামান্য ভৃত্যের ধৈর্য্য ও মহত্ত্ব দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বাদশা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। নিমিষে পাষাণগাত্রে মন্দার-কুসুম ফুটিয়া উঠিল। রঘুরাম মুক্তিলাভ করিলেন। সেইদিন যুবক পঞ্চশত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক পদে বরিত হইল।

---

(১) দন্ত ভগ্নের।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চাঁদের দাক্ষিণাত্যে গমন।

চাঁদ যমুনায় নিক্ষিপ্ত হইলে যমুনার সুশীতল সলিলস্পর্শে ধীরে ধীরে তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইতে থাকে এবং সে ধীরে ধীরে অতিকষ্টে উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। শেষে অমরাবতীতে না যাইয়া বরাবর দিল্লীতে গমন করে এবং বাদশাহের নিকটে অকপটে সমস্ত খুলিয়া বলে। কেবল তারার মাল্যদানের কথা ও তাহার যমুনায় নিমজ্জনের কারণ অবগত না থাকায় বলিতে পারে নাই।

চাঁদের অলোকসামান্য মহত্ত্ব-মহিমায় রঘুরাম নিষ্কৃতি পাইলেও তাঁহার অনুচরগণের যথোপযুক্ত শাস্তি হইল।

চাঁদের সৈনাপত্য লাভের পর তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। এই সময়মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া চাঁদ প্রধান বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহার অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য ও অসামান্য প্রতিভা দর্শনে বাদশা তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিয়া প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। এই সময় উজির মালেকজাদের উত্তেজনায় পারস্যবিজয় ও চীন

অভিযান ব্যাপারে যে অসমীক্ষকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ফলে রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য ও দেশময় বিদ্রোহ-দাবানল ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আবার যেন সুযোগ বুঝিয়াই দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী ভারতের সর্ব্বনাশসাধনমানসে করালমুখ ব্যাদান করিয়াছে। বাদশা প্রজাকুলের রক্ষার নিমিত্ত স্বকীয় বহুদিনের সঞ্চিত শস্যের ভাণ্ডারদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, বিদ্রোহ-দমনেও সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন, দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে, কিছুতেই উহা দমন করা যাইতেছে না, তখন উপযুক্ত-বোধে চাঁদকে তথায় প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে যমুনা দিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে বায়ুকোণাভিমুখে কিছুদূর উজান বাহিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী দিয়া দক্ষিণমুখে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার সুবিধাজনক রাস্তা ছিল। এ নিমিত্ত চাঁদ স্থলপথে না যাইয়া উল্লিখিত পথে সুবৃহৎ বজরায় দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিল। অনুগামী সৈন্যগণ পৃথক্ জলযানে রওনা হইল। এইরূপ গমনের তৃতীয় দিন পৌর্ব্বাহ্নিক স্নানাহারের নিমিত্ত চাঁদের বজরা বিহগপুর নামক স্থানে নঙ্গর করিল। অনুচরগণ পাকের আয়োজনে নিযুক্ত হইল।

চাঁদ বজরায় বসিয়া বিদ্রোহদমন-চিন্তায় নিমগ্ন আছে, এমন সময়. স্থলাবতীর্ণ জনৈক সৈনিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া সেনাপতি চাঁদকে অভিবাদন করিয়া কহিল,—“হুজুর, ঐ যে

তীরস্থ কোলাহলময় জনাকীর্ণস্থান হইতে লেলিহান অগ্নিশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করত ধূমপুঞ্জ উদ্গীর্ণ করিতেছে, ওখানে একজন যুবতী স্ত্রীলোককে হাত পা বাঁধিয়া আগুনে ফেলিবার চেষ্টা করা হইতেছে, সেই স্ত্রীলোকটি কেবলই আপনার নাম করিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে।” চাঁদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সন্নদ্ধ-বেশ পরিগ্রহ করিয়া এক লম্ফে ডাঙ্গায় নামিল এবং তড়িদ্গতি জনতার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার বীরত্ব-ব্যঞ্জক অমিততেজোমূর্ত্তি দেখিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। চাঁদ তখন অবাধে অগ্নিকুণ্ড-পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সে তথায় যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অতিমাত্র বিস্ময়ে তাহার প্রথমে দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়া উঠিল। শেষে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ব্যস্ততা সহকারে কহিল,—“দিদিমণি, তুমি এখানে?” এই বলিয়া দ্রুতহস্তে তাহার হস্তপদ-বন্ধন খুলিয়া দিল। তারা নিরুত্তরে চাঁদের কোলে ঝাঁপাইয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। চাঁদ, “জলদী পানি লাও” বলিয়া অনুচরদিগকে আহ্বান করিল; তৎক্ষণাৎ পানি আসিল, সে তাহা ধীরে ধীরে তারার মস্তকে মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার চেতনার সঞ্চার হইল, ক্রমে চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চাঁদের অনিন্দ্য-কান্তি চন্দ্রবদন তাহার চোকে পড়িল, কিন্তু অধিকক্ষণ সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। লজ্জা তাহার নয়নপল্লব নিমীলিত করিয়া দিয়া অন্তস্তল প্রেমসুধা-রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। সে প্রজ্বলিত শ্মশানভূমি, শচীর নিরানন্দ বিহারভূমি কুসুম মন্দার-

বাটিকা অপেক্ষা প্রীতিপদ ও সুখজনক বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। চিরপ্রেমসাধনা তাহার আজ আশ্চর্য্যভাবে ফলোন্মুখী হইতে চলিল।

চাঁদ তদবস্থায় তাহাকে কোলে লইয়া বজরায় আসিল এবং এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে উৎকৃষ্ট শয্যায় শোয়াইয়া দিল। দুইজন দাসী তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

ভীষণ পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে তারাকে রক্ষা করিয়া চাঁদ অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিল বটে, কিন্তু ভাবিতে লাগিল এখন কর্ত্তব্য কি? খোদাতায়ালার ইচ্ছায় সে যেমন করিয়াই এখানে আসিয়া থাকুক, এখন তাহাকে অমরাবতীতে পাঠানই কর্ত্তব্য। কিন্তু সে, যে কর্ত্তব্যের ভার মস্তকে লইয়া চলিয়াছে তাহাও ত গুরুতর ও বিষম। কালবিলম্বে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অনেক বিতর্কের পর চাঁদ শেষ কর্ত্তব্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিল। নাবিকগণ নঙ্গর তুলিয়া তখন দাক্ষিণাত্যের পথে বজরা ছাড়িয়া দিল। পৃথক্ নৌকায় হিন্দুয়ানীমতে তারার পাক-পানাহারের বন্দোবস্ত হইল।

কিছুক্ষণ পরে তারা পুনরায় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। গত ঘটনা চিন্তা করিয়া, বজরার আড়ম্বর দেখিয়া তাহার সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল যে, যাহাকে মৃত ও জলে নিক্ষিপ্ত শুনিয়াছি, সে কেমন করিয়া এখানে আসিল? এমন জাঁকজমকশালী লোকজনপূর্ণ নৌকাই বা সে কোথায় পাইল? তাহার অবস্থার এমন পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়

কি ? অথবা এ নৌকা কোন রাজামহারাজের হইবে, এখানেও সে ভৃত্যভাবে রহিয়াছে। ভৃত্যই বা কেমন করিয়া বলি, তাহাকে যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিলাম তাহাতে এ নৌকা তাহার নিজের হওয়াই সম্ভব। ফলতঃ সরলা অবলা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এই সময় সমুজ্জ্বল রত্নাভরণ-ভূষিতা বিচিত্র পট্টাম্বর-পরিহিতা এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া দাসীদ্বয় সভয়-সম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। তারাও সন্ত্রস্তে তখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং অত্যধিক বিস্ময়বিমূঢ়বৎ স্তব্ধনয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে অমন রূপ সে আর কখন দেখে নাই ; আগন্তুকা যুবতী পরমসুন্দরী হইলেও, সেও তারার রূপে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য হারাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে কহিল, “আপনি ভয়ানক বিপদ্ হইতে উঠিয়াছেন, শয়ন করিয়া সুস্থ হউন।”

তারা। এখন আমার বিশেষ কোন অসুখ নাই।

আ-যু। তা হ’লে সুখের কথা বটে। এখন আপনার বিপদের কারণ জানিতে পারি কি ?

তারা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল,—“আপনারা নৌকাপথে কোথা হইতে আসিতেছেন ?”

আগন্তুকা যুবতী মৃদুহাস্তে কহিল,—“দিল্লী হইতে।”

তারা। কোথায় যাইতেছেন ?

আ-যু। দক্ষিণ-দেশে।

তারা। কেন ?

আ-যু। বাদশার দুষমন দমন করিতে।

তারা। কে দমন করিবেন ?

আ-যু। যিনি আপনাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া এই বজরায় আনিয়াছেন।

তারার হৃদয় যুবতীজনসুলভ সংশয়ে আকুল হইয়া উঠিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তিনিই কি এই বজরার কর্ত্তা ?"

আগন্তুকা যুবতী কহিলেন,—"জি।"

তারার সন্দেহ বাড়িয়া উঠিল। আবার এই সময় একজন দাসী আসিয়া সেই যুবতীকে কহিল, "হুজুর আপনাকে ডাকিতেছেন!" তারার সন্দেহ চরমসীমায় উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, "তাহার চিরারাধ্য দেব কি তবে বিবাহিত ? এই যুবতীই কি তাহার হৃদয়ের অধীশ্বরী ?" হারানিধি হাতে পাইয়া পুনরায় তাহা পরহস্তগত হইতে দেখিলে ধনাধিকারীর হৃদয়ে যেরূপ আঘাত লাগে, তারার হৃদয়ে ক্রমশঃ সেইরূপ যাতনা আরম্ভ হইল। তাহার সুচারু বদন শোচনীয়রূপে মলিন হইয়া পড়িল। সে অবসন্ন হৃদয়ে পুনরায় শয্যায় শয়ন করিল। আগন্তুকা তারার এই ভাবান্তর বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া দাসীদ্বয়কে বিশেষভাবে তারার সেবাশুশ্রূষার আদেশ দিয়া প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল। নিরাশা-সন্দেহের দাবদাহে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া তারার দিন গেল। অপরাহ্নে সে শয়ন-প্রকোষ্ঠের ঝিলিমিলি খুলিয়া উদাসনয়নে আকাশের দিকে চাহিল, তখন নীলগগনপটের

প্রতীচী-চক্রবালে উপর্য্যুপরি সংন্যস্ত বরফপুঞ্জবৎ মেঘের রাশি সমুচ্চচূড় পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আর সার্কাসের হস্তীকে ধিক্কার প্রদান করিয়া প্রকৃতির ঐরাবত সেই পাহাড়ের উপর সম্মুখপদদ্বয় উন্নত করিয়া উর্দ্ধশুণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। সূর্য্য আবার তাহার পৃষ্ঠে স্বর্ণঝালড় ঝুলাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সাজসজ্জার নিমিত্ত অস্তগিরিভবনে প্রবেশ করিতেছিল। বজরার বাহকগণ তালে তালে ঝুপ্-ঝাপ শব্দে বহিত্র বাহিয়া চলিয়াছিল। আর সায়াহ্ন-মনোরম যমুনাতট তারার চোখের নিকট দিয়া নক্ষত্রবেগে বজরার পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতেছিল। সে সবই দেখিল কিন্তু কিছুই দেখিল না। সমীরণ বৈকালিক স্নানান্তে শুচিশুদ্ধ হইয়া তারার তাপজ্বালা জুড়াইতে সুধীরে তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু চিরপ্রেমসাধনা-বৈফল্যে যাহার মর্ম্মস্থল বিকল, অনিলের বাহু স্নেহ ও প্রলেপে ও বহির্জ্জগৎ-সৌন্দর্য্যে তাহার কি উপশম হইবে ?

এই সময় চাঁদ তারার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কহিল, “দিদিমণি, এখন শরীর ভাল আছে ?” তারা মাথায় কাপড় টানিয়া অপরিচিতা রমণীর ন্যায় নীরবে বসিয়া রহিল। নৈরাশ্য-দাবানলে যাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, সে অপরের কথার উত্তর কিরূপে দিবে ? চাঁদ তাহার কথার উত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “দিদিমণি, আমি দিল্লীতে থাকিতে কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি রাজপুত্রের অত্যাচারভয়ে যমুনায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছ ; কিন্তু এখন তোমাকে জ্বলন্ত-শ্মশানক্ষেত্রে পাইলাম ! এমন

স্বপ্নের অগোচর, চিন্তার অতীত, কল্পনার অনায়ত্ত ঘটনা কিরূপে ঘটিল?” তারার বাগ্‌রোধ কমিয়া আসিতেছিল, সে বলিতে চাহিল, তোমার জীবনের এমন পরিবর্ত্তনটি বুঝি কম বিস্ময়াবহ? কিন্তু হৃদয় রসনাকে অসংযত করিয়া তুলিল। তারা কহিল,—“তাহা শুনিয়া তোমার এখন আর কি লাভ?” চাঁদ অপ্রস্তুত হইল, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে কি যেন ভাবিয়া কহিল—“দিদিমণি, আমি বাদশার একটি গুরুতর আদেশ মাথায় করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইতেছি,—দয়াময়ের অনুগ্রহে মঙ্গলমত ফিরিবার সময়, তোমাকে অমরাবতীতে রাখিয়া যাইব। তুমি কোন চিন্তা করিও না।” এই বলিয়া চাঁদ তারার প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল।

চাঁদ চলিয়া যাওয়ায় তারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইয়া পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল—যাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়াছি, আর ফিরিয়া লইবার উপায় নাই, ইচ্ছা নাই, তাহাকে এমন রূঢ় কথা কেন কহিলাম? সে শত বিবাহ করুক, তাহাতে আমার কি! আবার দেখা পাইলে পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া লইব।

এই সময় সেই আগন্তুকা রমণী পুনরায় তারার কামরায় প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তারার মুখচন্দ্রমা পুনরায় হতাশ-মেঘে আবৃত হইল। আগন্তুকা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী ও পরমা বুদ্ধিমতী। সে ভাবিল মেয়েটি আমাকে দেখিয়া এরূপ হয় কেন? সে ইহার কারণ বুঝিতে পারিল না। সরলভাবে

কহিল,—"আমি আসিলে যদি আপনার অসুখ হয়, তবে আর আসিব না। আপনার যাহাতে অসুখ না হয় ভাই আমাকে তজ্জন্যই আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন।" তারা সবিস্ময় শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার ভাই কে?"

আ-যু। যিনি ইতঃপূর্ব্বে আপনার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন।

তারা যেন অতলস্পর্শ পাতাল হইতে সহসা আকাশে উঠিয়া পড়িল। নিরাশা-সন্দেহের নিবিড় মেঘরাশি তাহার হৃদয়-গগন হইতে নিমিষে অপসারিত হইল, হারামাণিক পাওয়ার মত তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে নবোজ্জ্বল মুখে আগন্তুকার হাত ধরিয়া কহিল—"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগন্তুকা হাসিয়া কহিল,—"আপনি আগে আমার দুইটি কথার উত্তর দিন।"

তারা। কি কথা?

আ-যু। আপনি আমাকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইতেছিলেন কেন?

তারা। আর কি কথা?

আ-যু। আপনার পরিচয় ও বিপদের কথা।

তারা। অঙ্গীকার করিলাম বলিব, কিন্তু আজ নয়।

আগন্তুকা শুনিতে আর জিদ করিল না।

অতঃপর আগন্তুকার সহিত অন্যান্য গল্প গুজবে ও হাসি-খুসীতে তারার দিন যাইতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যে তারা

জানিতে পারিল আগন্তুকা যুবতী চাঁদের কনিষ্ঠ সহোদরা পরিবানু। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, চাঁদ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থানকালে কথাপ্রসঙ্গে একদিন তারার নিকটে পরিবানুর কথা বলিয়াছিল। পরিবানুর স্বামী এখন দিল্লীপতির একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী সৈনিক; সে চাঁদের পৃষ্ঠপোষাকরূপে বিদ্রোহ দমনমানসে সপরিবারে দক্ষিণাত্যে চলিয়াছে। চাঁদ এই উপলক্ষে ভগিনীকে নিজের বজরায় লইয়া আসিয়াছে।

তারা যে একদিন চাঁদের প্রভুকন্যা ছিল, পরিবানু তারার সহিত বাক্যালাপে এইটুকু মাত্র অবগত হইতে পারিয়াছে। আর কোন কথাই তারা পরিবানুকে খুলিয়া বলে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

* * *

যুদ্ধ ও রাজ্য স্থাপন।

চাঁদ যথাসময়ে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি গোলবার্গের অনতিদূরে সেনা-নিবাস স্থাপন করিল এবং অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল, সিংহাসন-লোলুপ মন্ত্রী মালেক-জাদের চক্রান্তে প্রাদেশিক দেশমুখ্যগণ দাক্ষিণাত্যময় যে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। পরন্তু সেই বিদ্রোহ-বহ্নি লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। অসীম পরাক্রমী, অসীম সাহসিক চাঁদ তথাপি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল,—মহানুভব সম্রাটের জন্য প্রাণ যায় যাউক, বিদ্রোহ দমনে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইব না। সে বিশাল বিস্তীর্ণ বরাহ উপত্যকায় তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যের অভিনয়ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সে এই বহ্বায়ত উপত্যকার পশ্চাতে পুরোভাগে দক্ষিণে ও বামে অবাধ পরিক্রমণের উন্মুক্ত স্থান রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইল। চাঁদ গুপ্তচরের নিকট ঃ অবগত হইল বিপক্ষের উপস্থিত, সৈন্যসংখ্যা

পঞ্চচত্বাবিংশৎ সহস্র। ইহার তিন চতুর্থ সৈন্য অশ্বারোহী অসি বল্লভধারী, অবশিষ্ট সৈন্য তীর-ধনুকধারী পদাতিক। তাহাদের সেনাপতি আলী আকবর ঐবারত-সমুন্নত-দেহধারী এবং চির অপরাজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চাঁদের সৈন্যসংখ্যা পঞ্চদশ সহস্র মাত্র। ইহার অর্দ্ধেক সৈন্য অশ্বারোহী, অপরার্দ্ধ পদাতিক। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুলবাহিনীর সম্মুখীন হইতে চাঁদ প্রথমে ক্ষণকালের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু সহসা তাহার লাঠি শিক্ষায় ওস্তাদ সমশের খাঁর আশিষ বাণী তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি চাঁদের মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি বীরত্বগুণে ও সমরনৈপুণ্যে জগতে উমের কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবে। ওস্তাদের এই আশিসবাণী তখন চাঁদের হৃদয়ে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্যের বল প্রদান করিল। সে আল্লাহ আকবর রবে উচ্চ ধ্বনি করিয়া নিজ সৈন্যগণকে কহিল "ভ্রাতৃগণ, বিপুল বিপক্ষ সৈন্য দেখিয়া ভগ্নোদ্যম হইও না। দয়াময় খোদার অনুগ্রহে আমরা নিশ্চয় যুদ্ধে জয়লাভ করিব। তোমরা প্রস্তুত হও।" সেনাপতির উৎসাহ বাক্যে সৈন্যগণ নাচিয়া উঠিল। চাঁদ তাহাদিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পাঁচটি ব্যূহ রচনা করিয়া লইল। প্রথম দিন যথাসময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। সমস্তদিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। চাঁদ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিল না। কেবল মেঘান্তরিত ইন্দ্রের ন্যায় সমভাবে পঞ্চ-

ব্যূহের পর্য্যবেক্ষণ ও উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিল। বিপক্ষ বিপুল বাহিনী উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় সেই ব্যূহের উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নদীর সুদৃঢ় তটে প্রতিহত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া তরঙ্গ যেমন সমুদ্রবক্ষে প্রক্ষিপ্ত হয়, অরি-সৈন্যের আক্রমণ-দশাও তদ্রূপ হইতে লাগিল। সমস্ত দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। কোন পক্ষের জয় পরাজয় অবধারিত হইল না। উভয় পক্ষে হতাহত সৈন্যের শোণিতস্রাবে বরাহ-উপত্যকা রক্ত-সমুদ্রে পরিণত হইল। এই সময় সান্ধ্যতিমির-রাক্ষস বিশ্ব-গ্রাসে উদ্যত হইল। অরিপক্ষে বিরাম-দামামা বাজিয়া উঠিল। বীরকুলর্ষভ চাঁদ সৈন্যদল লইয়া স্কন্ধাবারে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

পরদিন সোবেসাদেকে চাঁদ-শিবির হইতে বিশ্ববিমোহন বিশ্বজাগরণ আজানধ্বনি উত্থিত হইয়া সুবিশাল বরাহ উপত্যকা মুখরিত করিয়া তুলিল। সৈন্যগণ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুত হইল। সেনাপতি চাঁদ একান্ত শ্রদ্ধাপূর্ণহৃদয়ে এমামের কার্য্য করিল। নামাজ অন্তে মোনাজাত,—চাঁদ দুইহাত তুলিয়া ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বলিতে লাগিল, "দয়াময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী খোদা, ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী হজরত রছুল ও তাঁহার আওলাদগণের উপর সর্ব্বাগ্রে তোমার অমিয় মঙ্গল অবতীর্ণ হউক। তোমার প্রেরিত পয়গাম্বর, আউলিয়া গওছ, কুতব পীর অলি মোহাদ্দেস্‌-গণের প্রতি তোমার প্রেমময় নির্ম্মল শান্তির ধারা বর্ষিত হউক,

তোমার অনুগত, ভক্ত পরহেজগার ইমানদার বান্দার উপর তোমার স্নেহসলিল সিঞ্চিত হউক। তৎসঙ্গে এই কীটাণুকীট দাসানুদাসকে সৈন্যগণ সহ সগৌরবে আজ উপস্থিত যুদ্ধে জয়-যুক্ত কর।" এইরূপে প্রার্থনা শেষ করিয়া চাঁদ সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার অনুমতি দান করিল। গভীরনাদে তাহার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। চাঁদ ক্ষিপ্রভাবে পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূর্ব্বস্থানে পূর্ব্ববৎ সৈন্য সমাবেশ করিয়া লইল। ভীষণ যুদ্ধারম্ভ হইল।

আজও দিনমান যুদ্ধ চলিল। বিপক্ষেরা চাঁদ-সৈন্য একপদ হঠাইতে পারিল না। পরন্তু চাঁদের সৈন্যচালন-নৈপুণ্যে ক্রমশঃ প্রতিপক্ষই পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। এবং তাহাদের প্রভূত সৈন্য নিহত ও ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। সেনাপতি আলী আকবর ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এই সময় সামন্ত বিদ্রোহী রাজগণের সমবেত চেষ্টায় নবাগত সৈন্যে রণস্থল পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আলী আকবর আবার বিপুল বিক্রমে যুদ্ধারম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু এতাধিক বলীয়ান্ হইয়াও তিনি চাঁদসৈন্যকে একপদও টলাইতে পারিলেন না। চাঁদের ব্যূহরচনা এমনি সুদৃঢ় ও এমনি কৌশল-পূর্ণ! সেইদিন রাত্রিতে আলী আকবর স্বপ্ন দেখিলেন, একজন ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ তাপস বলিতেছেন "বৎস, আর লোকক্ষয় করিও না।" এই স্বপ্নদৃষ্টে আলী আকবর শিহরিয়া উঠিলেন। এবং জয়ের আশায় সন্ধিহান হইয়া তৎক্ষণাৎ চাঁদ-শিবিরে

দূত পাঠাইলেন। চাঁদ পরমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। দূতবর কহিলেন “আমি যে প্রস্তাব লইয়া এখানে আসিয়াছি ; তজ্জন্য আপনি মনে করিবেন না আমরা দুর্ব্বল ভীত বা অসমর্থ।”

চাঁদ। না, না, আপনাদিগের যেরূপ সৈন্যবল, অর্থবল বিশেষতঃ আপনাদিগের সেনাপতি মহোদয় যেরূপ ধীর গম্ভীর ও পরাক্রমশালী তাহাতে আপনাদিগকে ঐরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র।

দূত। তবে শ্রবণ করুন, গত দুইদিন উভয় পক্ষে যে সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সহৃদয় সেনাপতি মহোদয়ের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সর্ব্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দভাবে দশবৎসর কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিব।

চাঁদ। আপনার কথা বিশ্বাস্য, কিন্তু আপনার মৌলিক প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিতে মরজি হয়।

দূত। আপনার অনন্যসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রম ও অতুল্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া আমরা সরল ভাবে প্রস্তাব করিতেছি—আপনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিয়া দিল্লীশ্বরের কুশাসন হইতে দেশ রক্ষা করুন এবং উজির বর মালেকজাদকে নামে মাত্র দিল্লীর সিংহাসন দান করুন।

ক্রোধ ও ঘৃণার অপবিত্র ছায়ায় চাঁদের মুখ আচ্ছন্ন

হইয়া পড়িল। তথাপি সে অবনত মস্তকে কহিল—“প্রাণ গেলেও আমি দিল্লীশ্বরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না।”

দূত। সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য একজন দুরাচার সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতা নহে।

চাঁদ। সম্রাট্ পরম ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ।

দূত। পারস্য ও চীন বিজয় উপলক্ষে প্রজার নিকট হইতে অমানুষিক অত্যাচারে অর্থ শোষণ এবং দৌলতাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া দিল্লীবাসিদিগকে তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমনের আদেশ দান ব্যাপারে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন প্রভৃতি বাতুলোচিত ঘটনা কি সম্রাটের ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে ?

চাঁদ। দূতবর, অবধান করুন—প্রথমতঃ পারস্য ও চীন বিজয় ব্যাপারে অর্থনাশ ও লোকক্ষয় ঘটিলে বাদশাহের প্রতি প্রজাগণের বিরক্তি ভাব জন্মিবে, তাহার ফলে ক্রমে দেশময় বিদ্রোহ ভাব উপস্থিত হইবে। বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়া মালেকজাদ সম্রাট্‌কে নিহত বা দেশতাড়িত করিয়া স্বয়ং বাদশাহীতক্ত দখল করিয়া লইবেন এই দারুণ দুরভিসন্ধিমূলে ষড়যন্ত্র করিয়া বাদশাহকে উল্লিখিত দিগ্বিজয়ে অত্যধিক উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—দিল্লীবাসী হীনচরিত্র স্বার্থপর লোকেরা সয়তান মালেকজাদের প্ররোচনায় বাদশাহকে অকারণ অশ্লীল অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া বেনামীতে

যে পত্র লিখিয়াছিল, সেরূপ পত্র কস্মিন্‌কালেও কোন প্রজা রাজাকে লিখিতে পারে না। তাই তাহাদের মুখ দর্শন বাদশাহের একান্ত অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ বাদশাহের প্রতি দিল্লীবাসীর দুর্ব্ব্যবহার ও উজিরের সয়তানী স্বভাব অপেক্ষা বাদশাহের ব্যবহার ও স্বভাব ভাল ও ধর্ম্মসম্মত।

দূতবর সমস্ত অবস্থা শুনিয়া ও চাঁদের মনের ভাব বুঝিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তাহাকে অভিবাদন করিয়া আসন ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রাতে উভয় পক্ষে পুনরায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। বীরবর চাঁদ আজ যুদ্ধের নূতন সাজে সজ্জিত হইল। তাহার ওস্তাদ সমশের খাঁন তাহাকে যে অভেদ্য গণ্ডার চর্ম্মের ঢাল ও চৌশিরধার তরবারি পারিতোষিক দিয়েছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে কোন যুদ্ধে সে তাহার ব্যবহার করে নাই। আজ তাহাই যুদ্ধার্থে বাহির করিয়া করে ধারণ করিল। গত দুইদিন যে প্রণালীতে যুদ্ধ চালাইয়াছিল, আজ তাহাও বদলাইয়া ফেলিল। আজ সে সমস্ত সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত হইল। চাঁদের শতরঞ্চ বংবিশিষ্ট বিজয়ী প্রিয়তম অশ্বের নাম "দেল-আরাম," সে তাহার পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তাল ঊর্ম্মিসঙ্কুলবৎ বিপুল বিপক্ষবাহিনী একবার সন্দর্শন করিয়া লইল। একবার মেঘনাদে আল্লাহ আকবর ধ্বনি করিয়া সেই বিপক্ষ বিপুলবাহিনীকে এক-যোগে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল। সেনাপতি আলী আকবর

দেখিয়া মনে করিলেন বাদশাহ সেনাপতি হয়ে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, না হয় বিদ্রূপ করিতে নটের বেশে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু চাঁদ যখন চন্দ্রপ্রভ চৌশির অশি নিষ্কাষিত করিয়া বীরদর্পে যথার্থই বিপক্ষবাহিনীর অতি সন্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার অনুগামী সৈন্য পূর্ব্বশিক্ষানুসারে তাহার পৃষ্ঠদেশেও পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আলী আকবরের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন সহসা সুযোগ বুঝিয়া সুযোগ পাইয়া একযোগে চাঁদকে চক্রব্যূহে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিল। চাঁদও আজ ইহাই চায়। চাঁদের "বাঐ ঝাঁক" চালে লাঠি খেলার কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। সে খেলা ও আজকার রণাভিনয়ে বোধ হয় কোন প্রভেদ নাই। বিপক্ষের বর্শা অসির আঘাত ভাদ্র-বাদল বারিধারার ন্যায় তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার দশদিক্ ঘুরাইয়া অসি চালনার এমনই কৌশল, তাহার বামকর ধৃত বর্ম্মের এমনি গুণ, তাহার দেল আরাম অশ্বের এমনি আস্ফালন উৎফুল্লতা, সর্ব্বোপরি তাহার ওস্তাদ সমশের খাঁনের এমনি বিস্ময়পূরিত অদ্ভুত শিক্ষা যে, সেই শত সহস্র আঘাতের একটি আঘাতও চাঁদের দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। অগাধ অনন্ত সমুদ্রমধ্যে তিমিঙ্গিল মৎস্য যেমন নাসারন্ধ্রে ও পুচ্ছ প্রহারে জলরাশি আন্দোলিত বিলোড়িত করিয়া তোলে, চাঁদের চৌশির ধার অসি ঘূর্ণনে ও অশ্বের আস্ফালন হ্রেষারবে তেমনি বিপুল বিপক্ষ অনিকিনী অস্থির হইয়া উঠিল। একজন যুবকের এত সাহস, এত বল এতাধিক সমরনৈপুণ্য জগতে প্রায়

দেখা যায় না। বীর সেনাপতি আলী আকবর চাঁদের রণাভিনয় দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এই সময় তিনি তাঁহার যাবতীয় সৈন্য সংযোগে সুদৃঢ় চক্রব্যূহ রচনা করিয়া চাঁদকে বন্দীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে তাহাতে ভীত না হইয়া সন্তুষ্ট হইল। সে যখন দেখিল যাবতীয় অরি সৈন্যের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইয়াছে, তখন অন্য লোকের অবোধ্য এক অপূর্ব্ব সঙ্কেতে সিংহ ধ্বনি করিয়া রণভূমি কম্পিত করিয়া তুলিল। চাঁদের পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত এই সময় তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যূহের সৈন্যগণ অরিপক্ষের চক্রব্যূহের পার্শ্ব দিয়া রাজধানী কোলবার্গের অভিমুখে নক্ষত্রগতি প্রধাবিত হইল। এই সময় কোলবার্গ প্রায় অরক্ষিত ছিল। সুতরাং অতি সহজে তাহা চাঁদ-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সেনাপতি আলী আকবর নিজ চক্রব্যূহের কতক সৈন্য লইয়া রাজধানী অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। চাঁদ তখন মনস্কামনাসাফল্যে আল্লাহো আকবর ধ্বনি করিয়া বিপক্ষের ভগ্ন চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া যাবতীয় সৈন্যসহ আলী আকবরের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কোলবার্গের নিকটে সম্মুখে চাঁদ-সৈন্য, পশ্চাতে চাঁদ-সৈন্য। দুই পাট যাঁতার মধ্যে পড়িলে কলাই আদি শস্যের সে দশা ঘটে, চাঁদের অদ্ভুত অচিন্ত্য কৌশলে আলী আকবর বিশাল বাহিনীসহ চাঁদ-সৈন্যের উভয় পার্শ্বের চাপে সেই দশায় পতিত হইলেন। বহু বিবেচনায় তিনি চাঁদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। চাঁদ সসম্মানে আলী

আকবরকে আলিঙ্গন দান করিলেন। কোলবার্গে সহজে সম্রাট্ মোহাম্মদ তোগলকের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইল।

সম্রাটের গুপ্তদূত সিদ্দিক আহম্মদ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া এই যুদ্ধের বিবরণ যথাযথ ভাবে বর্ণন করিলেন। তাহাতে চাঁদগুণমুগ্ধ সম্রাট্ স্বয়ং দৌলতাবাদে আসিয়া চাঁদকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এবং তাহাকে তাহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুবাদারী সনন্দ দান করিলেন।

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ সামন্তগণ অপ্রত্যাশিত রূপে চাঁদকে সুবাদার পাইয়া নিরাপত্তিতে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিল। দূরবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহদলপতিদল দলে দলে আসিয়া পৌরুষবিগ্রহ চাঁদের চরণতলে মস্তক অবনত করিতে লাগিল।

যাঁহার অলক্ষিত শক্তি মাহাত্ম্যে পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্র-সূর্য্য উদয়াস্ত গমন করিতেছে। যাঁহার ইঙ্গিতে অমাবস্যার অন্ধকারে বিশ্ব আবরিত ও পূর্ণ চন্দ্রালোকে ভুবন উদ্ভাসিত হইতেছে। পুরুভুজ প্রাণীকে শত টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও যাঁহার শক্তি সামর্থ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। পরন্তু যাঁহার অনন্ত ক্ষমতায় মহার্ণবে দ্বীপের ও নায়গারায় জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। আটলান্টিক সাহাবায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহার ইচ্ছায় ফকির বাদশাহ হইতেছে, আজ তাঁহারই করুণাকণার বলে কাঙ্গাল কৃষাণ ভৃত্য অর্দ্ধ ভারতের অধীশ্বর।

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ ।

চাঁদ ও তারার কথাবার্ত্তা ।

নবাব হইবার পর একদিন চাঁদ তারাকে কহিল,—“দিদিমণি, এতদিনে তোমাকে অমরাবতীতে পাঠাইবার অবসর পাইয়াছি। মনে করিয়াছি দুই চারি দিন মধ্যে আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে লইয়া তথায় রওনা হইব। আমাদের সংস্রবে থাকিয়া এযাবৎ আহার-বিহারে তোমার নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছে, এজন্য ক্ষমা চাই।” এস্থলে বলা বাহুল্য, চাঁদ বরাবরই তারার হিন্দুয়ানী মতে পাক-পানাহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছিল। তারা কোন উত্তর করিল না। হতাশের ক্ষোভে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বিষাদের কালিমায় তাহার মুখ-ছবি বিবর্ণ হইয়া গেল। চাঁদ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে তারার ভাবান্তর উৎপাদনমানসে কহিল,—“দিদিমণি, তোমাকে যমুনাতীরে কাহারা পোড়াইতে আনিয়াছিল ?” ধীরে উত্তর হইল,—“সে কথা যাক্, তুমি আমাকে আগুন হইতে রক্ষা করিলে কেন ? চিতায় পুড়িয়া মরাই আমার ভাল ছিল।” চাঁদ সবিস্ময়ে কহিল,—“দিদিমণি, এরূপ কথা কেন বলিতেছ ?” তারা সমধিক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—“কেন বলিতেছি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ?”

চাঁদ বিনীত ভাবে কহিল,—“হাঁ দিদিমণি, তোমার কথা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

তারা। অর্দ্ধ ভারতের নবীন ভূপতি তুমি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যার কথা কিরূপে বুঝিবে?

চাঁদ। দিদিমণি, তুমি অকারণ তিরস্কার করিলে আর কি করিব? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে, চাঁদ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইলেও চিরদিন তোমাদের অনুগত ভৃত্যই থাকিবে?

তারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এজন্মে কি আর প্রাণেশ্বরকে মনের ভাব বুঝাইয়া বলিতে পারিব না? হায়, যাহা বুঝাইতে যাই সবই ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয়! আজ বালিকা একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল বটে, তথাপি হৃদয়ের কথা সরল ভাবে খুলিয়া বলিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বালিকা আজ হৃদয়ের কথা প্রকাশের জন্য এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। সে কহিল—“তুমি এখন এক বিরাট্ দেশের স্বাধীন ভূপতি। কিন্তু তোমার দাসী মাত্র তিনটি দেখিতেছি কেন?”

চাঁদ। ইহাই যথেষ্ট।

তারা। ইহারা ত তোমার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী বলিয়া বোধ হয় না?

চাঁদ। সেরূপ দাসী পাওয়া কঠিন।

তারা। যদি পাওয়া যায়?

চাঁদ। তবে দুনিয়া স্বর্গে পরিণত হয়।

“তারা তোমার সেইরূপ দাসী হইবার আশা করে।”

এই কথা বলিয়া তারা পলকমধ্যে সরিয়া পড়িল। চাঁদ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। দুইদিন পর চাঁদ তারার সহিত দেখা করিয়া কহিল—"দিদিমণি, সেদিন তুমি বড়ই সাংঘাতিক কথা বলিয়াছ। তুমি আমার প্রভুকন্যা। আমি আমার ভগিনী পরিবানুকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, তোমাকেও সেইরূপ চক্ষে দেখিতেছি। সুতরাং তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার অসাধ্য। আগামী কল্যই আমি তোমাকে অমরাবতীতে পাঠানের বন্দোবস্ত করিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তারার বিষ ভক্ষণ।

সেই দিন অপরাহ্নে তারার শয়নকক্ষে হুলস্থূল কাণ্ড। সে বিষপান করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাহার চোক মুখ অল্প সময়ে নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদ শুনিয়া শশব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইল। তারা চাঁদকে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—“আমার নিকট আইস। সেই আগুনে পুড়িবার দিন যেমন করিয়া আমাকে ধারণ করিয়াছিলে, আজ আবার সেইরূপ করিয়া আমাকে ধর।” চাঁদ তারার বিছানায় বসিয়া তাহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। তখন সে প্রেমাস্পদের স্পর্শসুখানুভবে সেই নিদারুণ বিষের জ্বালা নিমিষে ভুলিয়া গেল। সে সুস্থ লোকের ন্যায় বলিতে লাগিল—

“তোমার দাসী হইবার আশায় এতদিন জীবিত ছিলাম, তুমি গ্রহণ করিলে না, সুতরাং এজন্মের আশা আমার ফুরাইয়াছে, তাই চলিলাম! উঃ দারুণ পিপাসা—একটু পানি।” চাঁদের আদেশে হিন্দু দাসী জল লইয়া আসিল কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; চাঁদ বুঝিয়া তখন বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। তারা কহিল,—“আমাকে কোল হইতে নামাইও

না, আমি বহুদিন পূর্ব্বে মোসলমান হইয়াছি, দাসীকে ঘরে আসিতে বল, তুমি নিজহাতে আমাকে পানি দেও।” চাঁদ বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। পরিবান্থুর ইঙ্গিতে দাসী আসিয়া তারাকে জলপান করাইল। তারা পুনরায় বলিতে লাগিল,—“যে সময় বাবা সোণার টাকাগুলি তোমাকে দিতে চাহিলেও তুমি লও নাই, সেই সময় পূজার ঘরে অজ্ঞাতসারে পূজার ফুলের সাজী আমার হাত হইতে খসিয়া পড়ে, আমি সেই সময় তোমাকে পতিত্বে—ওঃ কি জ্বালা! পানি।” দাসী পুনরায় পানি দিল। তারা পুনরায় জল পান করিয়া বলিতে লাগিল—“বরণ করিয়া লইয়াছিলাম, এই কারণ রাজপুত্রের সহিত বিবাহের দিন কেহ আমাকে খুঁ—“আর বলিতে পারিল না। তাহার নীল নয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তপরে পুনরায় কহিল, “প্রা—ণে—র চাঁ—দ,তা—রা—র সর্ব্ব—স্ব অ—পরা—ধ—ল—না—আল্লা” তারা মৃত্যুপথে প্রস্থান করিল, এই সময় সাক্ষাৎ পয়গাম্বর লোকমান হাকিমের ন্যায় ধবল উষ্ণীষ-ভূষিত এক ইউনানী হেকিম সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। চাঁদ বিমর্ষচিত্তে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তাঁহাকে,কহিল,—“আপনার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?”

হেকিম। একটী সর্পদষ্ট রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম।

চাঁদ। বাঁচিয়াছে কি?

হেকিম। আল্লার মরজি, রক্ষা পাইয়াছে।

চাঁদ। এই রোগিণী ত মারা গেলেন।

হেকিম সাহেব মৃতার নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গে আনীত ব্যাগ হইতে দুইটী গাছের শিকড় বাহির করিয়া মৃতার দুই কর্ণে যুগপৎ প্রবেশ করাইয়া দিলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। গতপ্রাণ জীবের আর ঔষধে কি হইবে? হাকিম সাহেবের মুখ মলিন হইল। তথাপি তিনি নীরবে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অৰ্দ্ধঘণ্টা পরে রোগিণী বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হাকিম সাহেব হর্ষোৎফুল্লে চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"আল্লা মেহেরবান্, আর ভয় নাই।"

অতঃপর হাকিম সাহেব রোগিণীর কর্ণপ্রবিষ্ট শিকড় দুইখানি বাহির করিয়া অগ্নিদগ্ধ করত সেই দগ্ধাঙ্গারের কিয়দংশ দুগ্ধযোগে বাঁটিয়া রোগিণীকে খাওয়াইয়া দিলেন এবং ৩৬ ঘণ্টা তাহাকে অনিদ্রিত রাখিতে বলিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময়ের অনুগ্রহে হেকিম সাহেবের ঔষধির গুণে তারা পুনর্জ্জীবন লাভ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চাঁদ ও তারার বিবাহ।

জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া, বিষ খাইয়াও তারার মৃত্যু ঘটিল না—চাঁদ যখন এই সকল অলৌকিক ঘটনার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইল এবং যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে স্বামী ভাবে না পাওয়াতেই তারা উল্লিখিত লোমহর্ষণরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, পরন্তু এখনও যদি তাহাকে গ্রহণ না করা হয়, তবে সে যেমন করিয়া হউক পুনরায় আত্মহত্যা করিবে। তখন চাঁদ তারার জীবন রক্ষার নিমিত্ত বিষম সমস্যায় পড়িয়া দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল,—যাঁহার সদাশ্রয়ে সুখে বাল্য ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, যিনি এক দিনের জন্যও আমার সহিত মন্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং পুত্রতুল্য স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আজ অর্দ্ধ-ভারতের অধিপতি হইয়াছি, সেই মহানুভব মনিব-কন্যার পাণিগ্রহণ করিব ? ইহাতে কি অধর্ম্ম হইবে না ? ইহাতে কি চরিত্রহীনতা প্রকাশ পাইবে না ? তারা মরে মরুক, তাহাতে জগতের কি ক্ষতি ? কিন্তু বিবাহ না করিলে শত সহস্র চাঁদের নৈতিক চরিত্র-প্রভায় দেশের

মুখ উজ্জ্বল হইবে। অতএব আমি এমন অধর্ম্ম ও নিমকহারামী করিতে পারিব না। হজরত ইউসফের ন্যায় চাঁদের হৃদয় সংযমের কঠোরতায় বজ্রে পরিণত হইল।

এদিকে পরিবানু তারার অলৌকিক প্রেমানুরাগ সন্দর্শনে আত্মহারা হইয়া তাহাকে ভাবীসাহেবা (১) করিয়া লইবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইল। সে ভ্রাতাকে জানাইল,—"তিনি যদি ঠাকুর-কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ না করেন,তাহা হইলে ঠাকুর-কন্যা ত পুনরায় প্রাণত্যাগ করিবেনই, আমিও তাঁহার অপার দুঃখ ও অপমানের সহানুভূতি দেখাইয়া আত্মঘাতিনী হইব।" স্নেহময়ী ভগিনীর উক্তি শুনিয়া সংযমী ধর্ম্মভীরু চাঁদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে আবার ভাবিতে লাগিল, তারা যে আমাকে প্রেমোপহার দিতে চায়, তাহা ত নিখুঁত নির্ম্মল। সে প্রেম, সে জলে ডুবাইয়া, আগুনে পোড়াইয়া, বিষে শোধন করিয়া পূত হইতে পূততর স্বর্গীয় পদার্থে পরিণত করিয়াছে, জাতিগত পার্থক্যের ভয়ও সে ঘুচাইয়া দিয়াছে, অতএব এমন ভাবে দেওয়া এমন ভাবে পাওয়া এহেন দুর্লভ বস্তুর প্রত্যাখ্যান ত মহাপাপ। আমি মূঢ়, তাই না বুঝিয়া এই মহাপাপের বোঝা মাথায় লইতেছি। এবম্বিধ চিন্তায় চাঁদের হৃদয়ে বিষম ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভাবান্তরে বজ্র বিগলিত হইতে চলিল। সে শেষ কর্ত্তব্যাবধারণে পীরের খেদমতে উপস্থিত হইতে মনন করিল।

রজনী গভীরা। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। প্রকৃতি স্থিরা

---

(১) ভাবী—ভ্রাতার স্ত্রী।

ধীরা নীরবা। কেবল গ্রীষ্মাতপক্লিষ্টা ধরিত্রীর বুক জুড়াইতে সমীরণ যেন নিদ্রালসভাবে থাকিয়া থাকিয়া মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছে। সুনীল গগনোদ্যানে সেতারা (১) ফুল ফুটিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। মিত্রের চিন্তাতরঙ্গায়িত চিত্তের প্রবোধনার্থেই বুঝি চন্দ্র আজ উদ্যানবিহারে উপস্থিত হয় নাই। তিমির এই সুযোগে সমস্ত বিশ্ব গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

গোলবার্গ রাজধানী এ সময় সুপ্ত। কেবল বিভিন্ন প্রসাদে দুইটী প্রাণী চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত ও জাগরিত। চাঁদ অনর্গলবদ্ধ শয়ন-মন্দিরে চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে উদাস ভাবে পাদচারণা করিতেছে। স্বর্ণ-শামদানে ঘৃতের বাতি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। এই সময় একটী রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা রমণীমূর্ত্তি দর্শনে ঈষৎ চমকিৎ হইয়া চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?" রমণী কোন উত্তর করিল না। ক্রমে সন্নিহিত হইয়া সহসা তাহার পদতলে গড়াইয়া পড়িল। চাঁদ কহিল,—"ছি দিদিমণি, এমনও করিতে আছে?" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সে সসম্ভ্রমে তাহার হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। তারা মর্ম্মভেদী করুণকণ্ঠে কহিল,—"প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ব্যথা দিও না! আর সহিবে না!"

চাঁদ। একটি দিনের সময় দেও।

---

(১) সেতারা—নক্ষত্র।

পদানতা তারা লগুড়াঘাতজর্জ্জরিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া কহিল,—"সময়! কেন?"

চাঁদ। আমাকে পীরের আদেশ লইতে হইবে।

তারা। তিনি যদি অনুমতি না দেন?

চাঁদ বক্তব্যবিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

তারা সহসা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকার উপর দীপালোকরশ্মি পতিত হওয়ায় তাহা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তারা দন্তে দন্ত চাপিয়া তীব্রস্বরে কহিল—"গ্রহণ করিলে না? তবে এই দেখ ব্রাহ্মণ-দুহিতা প্রিয়জনপরিত্যক্ত জীবন কিরূপে উপহার দেয়।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্ববক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে হস্ত উত্তোলন করিল। চাঁদ ক্ষিপ্রহস্তে হাত চাপিয়া ধরিয়া ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করিল। মরণোত্তেজিতা বালিকা অবসন্ন দেহে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া চাঁদের পদতলে আবার লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

এই ঘটনায় রাজপুরীর অন্যান্য মহিলাগণ জাগরিতা হইল। পারবানু আসিয়া দাসীগণসাহায্যে মূর্চ্ছিতা তারাকে কোলে তুলিয়া, তাহার শয়নঘরে লইয়া গেল এবং সেবা-শুশ্রূষায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল।

গোলবার্গের অনতিদূরস্থ বনপ্রান্তে গাজী দারাজ উদ্দীনের আস্তানা। তিনি ভবিষ্যদর্শী, শাস্ত্রবিশারদ,সিদ্ধকাম দরবেশ বলিয়া বিখ্যাত। চাঁদ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ইঁহাকে পীর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বিষম সঙ্কটে পড়িয়া সে প্রভাতে পীরের খেদমতে

হাজির হইল। চাঁদ সেখানে উপস্থিত হইলে, পীরসাহেব চাঁদের কথা না শুনিয়াই ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"বৎস! ধর্ম্মরূপ মহাদ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা দূরের কথা, তাহার একদেশের ক্ষুদ্রতম একটি কণিকারও উদ্দেশ্য নির্ণয় বা মর্ম্মাবধারণ করা আমাদের ন্যায় অপূর্ণের অসাধ্য। তবে আমার স্থূল জ্ঞানের অনুজ্ঞা এই যে, তুমি সত্বর সাত্ত্বিক প্রেমিকা ব্রাহ্মণ-দুহিতার পাণি গ্রহণ করিয়া তাহাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঐহিক পারত্রিক উভয়তঃই তোমার মঙ্গল হইবে।" চাঁদ পীরের বাক্য দৈববাণী মনে করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল।

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে চাঁদের সহিত তারার বিবাহ হইয়া গেল। এতদিনে তারা আকৈশোর-কঠোর-প্রেমসাধনার সাফল্যে সুখের সিংহাসনে আরোহণ করিল। প্রেমময়ী ভার্য্যালাভে চাঁদেরও কর্ম্মজীবন সুখের হইয়া উঠিল। তাহার অলোকসামান্য প্রতিভা ও পুরুষকার আরও উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সুশাসনে ও ন্যায়ধর্ম্মমূলে চাঁদ অল্প দিনেই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিল। বিবাহের পর একদিন পরিবানু তারার শয়নমন্দিরে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তারাকে কহিল,—"ভাবীঠাকুরুণ, আজ আমার সেই দুটী কথার উত্তর দিন?"

তারা। কোন্ দুটি কথা বুবুজান?

পরি। এত শীগ্‌গির অঙ্গীকার ভুলিয়া গিয়াছেন?

তারা বাস্তবিকই তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই সে স্মৃতির

মন্দিরে খানাতল্লাসী আরম্ভ করিল। পরিবানু কহিল,—"আপনি বজরামধ্যে আমাকে দেখিয়া বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন কেন ?" তারা হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"তোমাকে সতীন মনে করিয়া।"

পরি। আপনার মুখে আগুন!—কথা সমাপ্ত না হইতেই চাঁদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিবানু লজ্জাবিনম্রবদনে সেখান হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দণ্ডকারণ্য বিহার।

এই সুখের সময় একদিন তারা চাঁদকে প্রণয়পরিহাসে কহিল,—"ওগো দাক্ষিণাত্যের প্রভু, তোমার দণ্ডকবন কোথায় ?"

চাঁদ। তোমার রাজধানীর অনতিদূরে।

তারা। তবে দণ্ডকবন তোমার বলি কেন ? আমার।

চাঁদ। তাহাই।

তারা। আমি সেখানে বেড়াইতে যাইব।

চাঁদ। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

অতঃপর একদিন চাঁদ তারার মনস্তুষ্টিবিধানের জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে দণ্ডকারণ্য-বিহারে গমন করিল। দণ্ডকবন প্রকৃতিরাণীর চির রম্য রাজধানী। রাম-সীতার বিহার-কালে ইহা যেমন রমণীয় ছিল, আজ চাঁদ-তারার বিহার-সময়েও তেমনি সৌন্দর্য্যে ভরপূর রহিয়াছে। প্রভেদ এই,—রাম-সীতার সময়ে এই নিসর্গ রাজধানী অসভ্য জনমানব কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ছিল, এখন চাঁদ-তারার সময়ে ইহার বিভিন্ন অংশে সুসভ্য হিন্দু মুসলমান জাতি বসতি বিস্তার করিয়াছেন।

কিন্তু তাহাতে ইহার প্রাকৃতিক সুষমার ব্যত্যয় ঘটে নাই। এখনও কবিগুরু-বর্ণিত সীতার সেই রজত-শুভ্র-লহরী ইন্দীবরোরসি গোদাবরী, নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া কুলকুল আরাবে বহিয়া যাইতেছে। এখনও সেই গোদাবরী-স্বচ্ছসলিলে নিশাকান্ত-কান্তি প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতির বরপুত্রগণের নয়ন মন মুগ্ধ করিতেছে। এখনও মৃগকুল সেই গোদাবরী-সৈকতের শ্যামল শস্যে উদর পূর্ত্তি করত স্ফটিকস্বচ্ছ জল পানে তৃপ্তি লাভ করিতেছে। এখনও বসন্তসমাগমে নব নব ফুলকুল বিকশিত হইয়া সে বনের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছে। মলয়ানিল সে ফুলরাশির সৌরভ বাহিয়া দিগন্ত আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। মধুব্রত সে ফুলের মধু লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মধুচক্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছে। এখনও সেই বিশ্ববিমোহন বনের শাখাবহুল বিশাল তরুমূলে হরিণ-হরিণী ময়ূর-ময়ূরী কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পঞ্চবটীশিরে সমাসীন মধুসখা স্বরমধু-ধারায় কাননরাজি প্লাবিত করিয়া তুলিতেছে, আবার বনদেবীর বীণাস্বরে সে স্বর আরও মধুরতর হইয়া উঠিতেছে।

দণ্ডকবনে উপস্থিত হইয়া চাঁদ গোদাবরী-তটে বিশ্রামার্থ পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইল।

একদিন পঞ্চবটীর লতাবিতানে উপবেশন করিয়া তারা চাঁদকে প্রেমসম্ভাষণে কহিল,—"প্রাণেশ্বর, দণ্ডকারণ্যের মনোহারিত্ব যাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, আজ তোমার গুণে তাহ'

স্বচক্ষে দেখিয়া জীবন ধন্য বোধ করিতেছি।” চাঁদ আদর-সোহাগে তারার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল,—“প্রিয়তমে! এখন তিনটি কর্ত্তব্য আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বিষয় হইয়াছে। প্রথম কায়মনোবাক্যে খোদার বন্দেগী, দ্বিতীয় প্রজার রঞ্জন, তৃতীয় তোমার মনস্তুষ্টিসম্পাদন। অতএব তুমি যখন যে অভিলাষ করিবে, অম্লানচিত্তে তাহা পূর্ণ করিব।”

এই সময় একটী সুন্দর হরিণ, লতাগৃহ জনশূন্য ভাবিয়া তথায় প্রবেশ করিতেছিল, চাঁদ তারাকে কহিল,—“দেখ দেখ! কেমন সুন্দর একটী হরিণ আমাদিগের দিকে আসিতেছে।” তারা দেখিয়া কহিল,—“তাইত! হরিণটিকে ধরিতে পারিলে রাজধানীতে লইয়া যাইতাম।” চাঁদ উহাকে ধরিতে উদ্যত হইলেই সে ছুটিয়া পলাইল। চাঁদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তারা “যেও না যেও না, তুমি বাঘের মুখে পড়িবে” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চাঁদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া হরিণের উদ্দেশ্যে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং সত্যই সে এক ভীষণ আকার ব্যাঘ্রের সম্মুখে পতিত হইল, কিন্তু অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও বিক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া লতাগৃহে ফিরিয়া আসিল। তারা কহিল—“তোমাকে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত দেখিতেছি?”

চাঁদ। তুমি কি পিতাঠাকুরের নিকট গণনা বিদ্যা শিখিয়াছিলে?

তারা। কেন?

চাঁদ। আমি সত্যই বাঘের সম্মুখে পড়িয়াছিলাম।

তারা শিহরিয়া উঠিল। পরে কহিল,—"কে বলে স্বপ্ন অমূলক। আমি রঘুরামের গৃহে আবদ্ধ হইয়া রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, 'তোমার সহিত দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণকালে তুমি বাঘের মুখে পড়িয়াছ'।"

চাঁদ কহিল—"স্বপ্ন পরলোকের কাছাকাছি, তাই অনেক সময় উহা সত্য হয়।"

তারা। গত রাত্রিতে আমি আমার পিতামাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি।

চাঁদ। কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছ?

তারা। শোকাতুর ও দরিদ্রাবস্থায়।

চাঁদ। আমি তাঁহাদিগকে গোলবার্গে আনিতে চাই?

তারা। সে তোমার অনুগ্রহ।

চাঁদ। অনুগ্রহ নয়, কর্ত্তব্য।

তারা। তোমার কর্ত্তব্য তাই বামণের মেয়েকে মুসলমান করিয়াছ!

চাঁদ। তা নয় গো, তা নয়! উহা প্রেমঠাকুরের বিচিত্র ঘটকালিতে ঘটিয়াছে।

তারা চাঁদের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহার গণ্ডে গাঢ় চুম্বন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০⁕০—

জামাই বাড়ী।

এইরূপে কিয়ৎদিন 'অতিবাহিত হইলে তাহারা দণ্ডকারণ্য হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সময় একদিন বিশ্রম্ভালাপের সময় চাঁদ তারাকে কহিল,—"বেগম সাহেবা, মহারাজ রঘুরামের বিবাহের দিন তুমি কোথায় লুকাইয়া ছিলে ?"

তারা। অনুমান কর।

চাঁদ। যে ভাবে খুঁজিয়া দেখা হইয়াছিল তাহাতে অনুমানে স্থান নির্দ্দেশ করা আমার বুদ্ধির অসাধ্য !

তারা। নবাবী বুদ্ধিতে যে কুলাইবে না, তা বুঝেছি গো বুঝেছি !

চাঁদ। আচ্ছা, বেগম-বুদ্ধিতেই খুলিয়া বলা হো'ক।

তারা। বেগম-বুদ্ধি তখন গজায় নাই ! তোমার প্রেম-ঠাকুরের উপদেশে আমাদের বাগানের পুরাণ কাঁটাল গাছের কোটরে লুকাইয়াছিলাম।

চাঁদ শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

অনন্তর একদিন দুইখানি পাল্কী ও একখানি চতুর্দ্দোলা শতাধিক সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া কুলবার্গ রাজধানী-চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাল্কীর একখানিতে ঠাকুর

মহাশয়, অন্য খানিতে মহামায়া আসিলেন। চতুর্দ্দোলায় পদ্মা ছিল।

চাঁদ ঠাকুরমহাশয়কে যথাবিধি সংবর্দ্ধনা করিয়া গ্রহণ করিল। বাঁদীগণ মহামায়াকে ঘিরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। পদ্মাও তৎসঙ্গে গমন করিল।

তারা মাকে দেখিয়া "মা, মা" বলিয়া সম্মুখে আসিতেই মহামায়া তারাকে দৃষ্টিমাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। "হায় কি সর্ব্বনাশ করিলাম!" বলিয়া তারা মায়ের মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল এবং তাহার আদেশে কতিপয় বাঁদী মহামায়ার চোখে মুখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। পদ্মা দেখিয়া শুনিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর মহামায়া চৈতন্য লাভ করিলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিতে সাহস পাইলেন না। নিমীলিত নেত্রেই কহিলেন—"আমি কোথায়?" উত্তর হইল—"জামাই বাড়ী।" স্বপ্নে জামাই বাড়ী যাওয়ার সেই পুরাণ স্মৃতি মহামায়ার মনে জাগিয়া উঠিল।

পদ্মা। রাধামাধব! এ যে মোসলমান বাড়ী।

কিঞ্চিৎ কোপনা ও মুখরা, প্রবীণা ও রসিকা পরন্তু তারার একান্ত বিশ্বস্তা ও চতুরা হুশিয়ারজান নাম্নী এক বাঁদী ছিল। মহামায়ার উল্লিখিত কথার উত্তর সেই দিয়াছিল। পদ্মার কথার পৃষ্ঠেও সে কহিল—"রাধামাধব তোমার কে গা?"

ব্রজের গোপিনী পদ্মা বিশেষ বিভুঁই ভাবিয়া সুধীরে কহিল,—"মা, রাধামাধব আমাদের দেবতা।"

হুশিয়ার। তাই বুঝি মুসলমান জামাই পছন্দ হইতেছে না!

পদ্মা এ কথার আর কোন উত্তর করিল না।

তারা কহিল,—"দূর পোড়ার মুখী!"

মহামায়া ইত্যবসরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং তারাকে "মা আমার" বলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মেয়ে মায়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ডাকিল,—"মা!" স্নেহাভিভূতা মা কহিলেন—"কি মা?"

তারা। মা, আমি বড় অপরাধের কাজ করিয়াছি।

মা মেয়ের মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন—"অপরাধ কি মা? সব ভগবানের ইচ্ছা। আমি পূর্ব্বেই এ বিষয় স্বপ্নে দেখিয়া কর্ত্তাকে বলিয়াছিলাম।"

তারা। বাবা আমাকে ঘৃণা করিবেন!

মা। তোমার একটি চাকরাণী পাঠাইয়া তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া আন।

তারার আদেশে হুসিয়ারজান বাহির বাড়ীতে যাইয়া ঠাকুর-মহাশয়কে কহিল,—"বেগমসাহেবা আপনাকে ডাকিতেছেন।" অসূর্য্যম্পশ্যনবাব-অন্তঃপুরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি চাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

চাঁদ। আপনি নিঃসঙ্কোচে অন্দরে যান।

ঠাকুরমহাশয় হুশিয়ারের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মরা মেয়েকে স্ত্রীর কোলে জীবিত দেখিয়া তিনি তিন হাত

দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহামায়া কহিলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, হারাধন ত ফিরে পেয়েছি।"

ঠাকুরমহাশয় কন্যাকে বেগমের বেশভূষায় শোভিতা দেখিয়া সব বুঝিতে পারিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"প্রাক্তনের গতি কে ফিরাইবে, ভগবানের লীলাই বা কে বুঝিবে?" তিনি বহির্ব্বাটীতে ফিরিয়া আসিলে, চাঁদ আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কহিল,—"আত্মহত্যা মহাপাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি তারার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।"

ঠাকুরমহাশয় শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং চাঁদকে কহিলেন,—"বৎস, তোমাদের বিবাহ অসম্পন্ন রহিয়াছে। বাড়ীর ভিতর চল।"

চাঁদ ঠাকুরমহাশয়ের সহিত অন্দরে আসিল, ঠাকুরমহাশয় তারাকে চাঁদের বামপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া তাহার হস্ত চাঁদের হস্তে সমর্পণ করত কহিলেন,—"লীলাময় ভগবানকে সাক্ষী করিয়া আমি অদ্য আনন্দের সহিত আমার এই হারাধন কন্যাটি তোমার করে সম্প্রদান করিলাম, ইহাকে সযত্নে রাখিও।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাহমণি রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

তিনদিন পর বিপুল আয়োজনে গোলবার্গ রাজধানীতে দরবার বসিল। চাঁদ ঠাকুরমহাশয়কে দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া সিংহাসনে আসীন হইলেন। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত সর্দ্দারগণ ও সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলীতে দরবার-গৃহ গোলজার হইয়া উঠিল। চাঁদ দরবারে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্রে ঠাকুরমহাশয়ের গুণগ্রাম ও পরিচয়াদি বর্ণনা করিলেন। পরে স্বমুখেই ঘোষণা করিলেন,—“অদ্য হইতে এই ব্রাহ্মণকুলভূষণ মহানুভব ব্যক্তি আমার রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার চিরস্মৃতি রক্ষার্থে আমার বংশ অতঃপর, “বাহমণি বংশ” নামে খ্যাত হইবে। পরন্তু অদ্য হইতে আমার পিতৃদত্ত হাসন নামের সহিত ইঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া আমি “হাসন-গঙ্গা বাহমণি” উপাধি ধারণ করিলাম।

সেই দিন হইতে চাঁদের পৌরুষ ও কৃতজ্ঞতা ও গঙ্গারাম ঠাকুরের মহতী উদারতা শাশ্বত স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

উপসংহার।

বাদসা উজির মালেক জাদের ভীষণ ষড়যন্ত্র যখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, [illegible]ন রাজদ্রোহিতা অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিলেন।

রঘুরাম চাঁদের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া স্বভাবদোষে পুনরায় ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, এজন্য প্রজালোক একান্ত উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে শতটুকরা করিয়া কাটিয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

যে রাত্রে তারা যমুনায় আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহার পর দিন প্রত্যূষে দেবানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক যাজক ব্রাহ্মণ শিষ্যবাড়ী হইতে নৌকাপথে বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি সদ্যোমৃতা তারাকে নৌকার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মাল্লাগণ-সাহায্যে তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লন, এবং অশেষবিধ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় তাহার জীবন রক্ষা করিয়া বাড়ী লইয়া যান। পরে তিন বৎসর কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিয়া প্রচুর ধনলোভে ধনবন্ত অপর এক ব্রাহ্মণের অপস্মার-রোগগ্রস্ত পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। তারার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পৈশাচিক বলে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিধাতার বিধানে পাত্র বাসরঘরে প্রবেশকালে পাদমূলে আঘাত প্রাপ্ত

হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করে। তৎকালে হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার প্রবল প্রচলন ছিল। তাই তারাকে সহমরণে যাইতে হয়। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

তারার মাতা পিতা গোলবার্গে আসিবার পর তারা তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা, পরীক্ষিত কোথায় ?"

মা। কর্ত্তা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা[illegible] জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন।

তারা। তোমাদের জামাই তাহাকে খাজানা-খানার অধ্যক্ষ করিবেন বলিয়াছেন।

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক ।

১।	আনোয়ারা—৫ম সংস্করণ, মূল্য	১।০
২।	প্রেমের সমাধি—২য় সংস্করণ, মূল্য	১।০
৩।	পরিণাম, মূল্য	১৲

পুস্তকগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কথা ।

বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে বাঙ্গালাভাষায় যতগুলি উপন্যাস রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে আনোয়ারা সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেকের মতে প্রেমের-সমাধি আনোয়ারা অপেক্ষাও উত্তম হইয়াছে। বিচারভার পাঠকগণের উপর। প্রথম সংস্করণ হইতেই সদাশয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আনোয়ারা, লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। প্রেমের সমাধিও অনুমোদিত হইবার আশা আছে। বিবাহে যুবক-যুবতীদিগকে উপহার দেওয়ার জন্য আগাগোড়া ধর্ম্মভাবপূর্ণ এই দুখানিই সর্ব্বোত্তম পুস্তক।

গ্রন্থকার প্রণীত পরিণামও অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস। আনোয়ারা ও প্রেমের সমাধির পাঠক ইহা একবার পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। খাঁটি ও স্বাভাবিক সমাজচিত্র যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই মনোরম ও উপদেশপ্রদ। ফলতঃ সমাজের মঙ্গলের জন্য গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ উল্লিখিত পুস্তকগুলিতে যেরূপ সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছে, অন্য কোন ঔপন্যাসিকের লেখনীতে তদ্রূপ হইয়াছে বলিয়া জানি না।

প্রাপ্তিস্থান—

মোবারক আলী মিঞা
ম্যানেজার—মখদুমী লাইব্রেরী
৫।এ, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।